সহজ ধর্মীয় শিক্ষা

(ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক)

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রীভগবান্ উবাচ

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ০৯/৩৪)

সরলার্থ : শ্রীভগবান বলেছেন-তুমি সর্বদা (১) মনকে আমার চিন্তায় নিযুক্ত কর, (২) আমাতে ভক্তিমান হও, (৩) আমার পূজা কর, (৪) আমাকেই নমস্কার কর । এরূপে মৎপরায়ণ (শরণাগত) হয়ে আমাতে মন সমাহিত করতে পারলে আমাকেই প্রাপ্ত হবে ।।

মাঙ্গলিক মন্ত্র-

তেজো অসি তেজো ময়ি ধেহি । বীর্যমসি বীর্যং ময়ি ধেহি ।
বলমসি বলং ময়ি ধেহি । ওজো অসি ওজো ময়ি ধেহি ।
মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি । সহো অসি সহো ময়ি ধেহি ।

(শুক্ল যজুর্বেদ, ১৯/৯)

সরলার্থ : হে পরমেশ্বর, তুমি (তেজঃ অসি) তেজস্বরূপ আমাকে তেজ (ধেহি) দান কর, তুমি (বীর্যম্ অসি) বীর্য্যস্বরূপ আমাকে বীর্যবান কর, তুমি (বলম্ অসি) বলস্বরূপ আমাকে বলবান কর, তুমি (ওজঃ অসি) জীবনীশক্তিস্বরূপ আমাকে (ওজঃ) শক্তিমান কর, তুমি (মন্যুঃ অসি) অন্যায়দ্রোহী আমাকে অন্যায়ের প্রতিরোধ শক্তি দান কর, তুমি (সহঃ অসি) সহ্যশক্তিস্বরূপ আমাকে সহনশীল কর ।

মধুমন্ত্র-

মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ ।
মাধ্বীর্ন সন্তু ওষধীঃ ॥ ১
মধুনক্তম্ উতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ॥ ২
মধুমান্ নঃ বনস্পতিঃ মধুমান্ অস্তু সূর্যঃ ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ॥ ৩ (ঋগ্বেদ ১/৯০/৬-৮)

সরলার্থ : (ঋতায়তে) সৎপরায়ণ ব্যক্তির প্রতি (বাতাঃ) বায়ুসমূহ মধুর হয়; (সিন্ধবঃ) নদীসমূহ মধুময় রস ক্ষরণ করে; আমাদের নিকট ওষধিসমূহ (মাধ্বী) মধুময় হউক । ১
(নক্তম) রাত্রি এবং (উত উষসঃ) দিবসসকল শান্তিময় হউক; (পার্থিবং রজঃ) বিশ্বচরাচরে বিরাজ করুক শান্তি; পিতৃস্থানীয় দ্যুলোক আমাদের নিকট শান্তিময় হয়ে উঠুক । ২
(বনস্পতি) অরণ্যাধিপতি আমাদের নিকট (মধুমান্) মিষ্টি ফল প্রদান করুন; সূর্য আনন্দ প্রদায়ক হউন । আর (গাবঃ) গাভীগণ আমাদের (মাধ্বীঃ) সুখপ্রদ হউন । আমাদের জীবন মধুময় হউক ।

সহজ ধর্মীয় শিক্ষা

(ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও বয়স্ক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য)

সম্পাদনায়

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়
শীর্ষক প্রকল্পের কারিকুলাম কমিটি

ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ
ড. কৃষ্ণেন্দু কুমার পাল
মোঃ রফিকুল ইসলাম
নিত্য প্রকাশ বিশ্বাস
মোঃ মনির হোসেন মজুমদার
অসীম চৌধুরী
মোছাঃ নার্গিস আক্তার
মোঃ নুরুজ্জামান
প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস
কাকলী রানী মজুমদার

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সহজ ধর্মীয় শিক্ষা

(ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও বয়স্ক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য)

সম্পাদনা : মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের কারিকুলাম কমিটি

স্বত্ব : প্রকল্প কর্তৃক সংরক্ষিত

সহযোগিতা : মিন্টু কুমার ভদ্র, সহকারী প্রকল্প পরিচালক
সমীর বিশ্বাস, মাস্টার ট্রেইনার কাম ফ্যাসিলিটেটর
মোহাম্মদ আলী, কম্পিউটার অপারেটর
মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়

প্রকাশনায় : মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রথম প্রকাশকাল : বৈশাখ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/এপ্রিল, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ
তৃতীয় প্রকাশকাল : কার্তিক, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

মুদ্রণ সংখ্যা : ৭৪,৫০০ কপি

মুদ্রণ ও বাঁধাই : ফরাজী প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
১০১, মাতুয়াইল দক্ষিন পাড়া, মোঘলনগর, ডেমরা, ঢাকা-১৩৬২ ।

মুখবন্ধ

শিক্ষা মানুষের আচরণ পরিবর্তনের এমন একটি পরিশুদ্ধ প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য পরিস্ফুটিত হয়। ব্যক্তির বিবেকবোধ জাগ্রত হয়, নৈতিক চরিত্র উন্নত হয় এবং তাঁর আত্মশুদ্ধি ঘটে। তাই শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। শিক্ষা ব্যক্তির আত্মা ও আধ্যাত্মিক চিন্তা চেতনাকে উন্নীত করে বিধায় শিক্ষার সাথে নৈতিক শিক্ষাকে সমন্বয় করে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হয়ে থাকে। ধর্মীয় শিক্ষা লাভের মাধ্যমে মানুষ ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পূণ্য বোধ সম্পর্কে জাগ্রত হয়। ধর্মীয় ভীরুতা থেকে ব্যক্তির দৈনন্দিন চলন বলনেও তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। তাই প্রত্যেকেরই ধর্মীয় কুসংস্কার ও গোঁড়ামী পরিহার করে উন্নত সমাজ ব্যবস্থা ও প্রগতিশীল রাষ্ট্র বিনির্মাণের লক্ষ্যে মানব কল্যাণে এগিয়ে আসা উচিত। ধর্মের মৌলিক নির্দেশনাকে সহজভাবে মানবকল্যাণে কাজে লাগানোর শিক্ষায় ব্রতী হওয়া উচিত। "মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটি সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে বাস্তবায়িত একটি প্রকল্প। প্রকল্পটি মূলত দেশের সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর নৈতিক, সামাজিক, আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ লক্ষ্যে প্রকল্পের ৬ষ্ঠ পর্যায়ে ধর্মীয় শিক্ষা শিশু (বয়স ৬-১০ বছর) ১,০০০টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে এবং ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক (বয়স ১০+) ১,৪০০টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালনা করছে।

সনাতনী সম্প্রদায়ের নিকট নৈতিক শিক্ষাকে প্রাণবন্ত করতে প্রকল্পের আওতায় ২,৪০০টি শিক্ষাকেন্দ্রে **'সহজ ধর্মীয় শিক্ষা'** নামক একটি পাঠ্যবই রয়েছে। বইটি মূলত সনাতন ধর্মের বিভিন্ন মর্মবাণী, সৃষ্টির রহস্য, জীবনাচরণের প্রতিটি পদক্ষেপে করণীয়, পূজা-পার্বন, সনাতন ধর্মের মৌলিক বিভিন্ন প্রশ্ন এবং জিজ্ঞাসার সমন্বয়ে মানবকল্যাণে ব্যক্তিকে ব্রতী করার মানসে প্রণয়ন করা হয়েছে।

'সহজ ধর্মীয় শিক্ষা' বইটি প্রণয়নে প্রকল্পের কারিকুলাম কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দের আন্তরিক প্রচেষ্টাকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। বইটির কারিকুলাম প্রস্তুত, ছবি সংযোজন ও বিষয়বস্তু নির্বাচনের সাথে বিশেষভাবে জড়িত থেকে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বইটি প্রণয়নে যেসকল সম্মানিত লেখকের লেখনী থেকে সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়েছে তাদের মধ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, প্রশ্নোত্তরে সহজ পাঠ্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও নৈতিক শিক্ষা, সংকলন ও গ্রন্থনা-প্রকৌশলী শ্রী রঞ্জিত রায়, নিউইয়র্ক, আমেরিকা, হিন্দুর ধর্মকথা-প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস, বেদের কথা-মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, https://mandirdarshanbd.com, এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'সহজ ধর্মীয় শিক্ষা' বইটি তৃতীয় বার মুদ্রণ করা হয়েছে। বইটি মুদ্রণের ক্ষেত্রে মুদ্রণজনিত অনিচ্ছাকৃত কোন ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা পরবর্তী সংস্করণ ও মুদ্রণে সংশোধনের প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

পরিশেষে 'সহজ ধর্মীয় শিক্ষা' বইটি দেশের সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর আত্মিক ও নৈতিক উন্নতিকল্পে বিশেষ অবদান রাখবে এই প্রত্যাশা করছি।

ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ
যুগ্মসচিব
প্রকল্প পরিচালক
মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়।

সূচিপত্র

পাঠক্রম	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
	জাতীয় সংগীত ও শপথবাক্য	৫
	রণ সংগীত	৬
পাঠ-১	স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টি	৭-৮
পাঠ-২	নৈতিক শিক্ষায় পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব	৯-১০
পাঠ-৩	সংস্কৃত বর্ণমালা পরিচিতি দেবনাগরী বর্ণমালা (স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ)	১১-১৯
পাঠ-৪	ঈশ্বরের ঐশ্বর্য (সনাতন ধর্মের বিভিন্ন দেব-দেবীর পরিচিতি)	২০-২৫
পাঠ-৫	যোগাসন ও প্রাণায়াম	২৬-২৭
পাঠ-৬	নিত্যকর্ম ও ত্রিসন্ধ্যা	২৮-৩৩
পাঠ-৭	সনাতন ধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থ পরিচিতি	৩৪-৩৭
পাঠ-৮	অবতারবাদ	৩৮-৪২
পাঠ-৯	মহাত্মাগণের পরিচিতি	৪৩-৫২
পাঠ-১০	মন্দির ও তীর্থস্থান পরিচিতি	৫৩-৬১
পাঠ-১১	সমবেত প্রার্থনা ও প্রার্থনা সঙ্গীত	৬২-৬৭
পাঠ-১২	নৈতিক শিক্ষায় ধর্মীয় উপাখ্যান	৬৮-৭২
পাঠ-১৩	প্রশ্নোত্তরে সনাতন ধর্ম (প্রশ্নব্যাংক)	৭৩-৮০

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি

ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে-
ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কি মায়া গো-
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে-
মা, তোর বদন খানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়ন জলে ভাসি ॥

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শপথবাক্য

"আমি শপথ করিতেছি যে, মানুষের সেবায় সর্বদা নিজেকে নিয়োজিত রাখিব। দেশের প্রতি অনুগত থাকিব। দেশের একতা ও সংহতি বজায় রাখিবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকিব।

হে মহান সৃষ্টিকর্তা, আমাকে শক্তি দিন, আমি যেন বাংলাদেশের সেবা করিতে পারি এবং বাংলাদেশকে একটি শক্তিশালী ও আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে গড়িয়া তুলিতে পারি।"

রণ সংগীত

কাজী নজরুল ইসলাম

চল্ চল্ চল্!
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল,
নিম্নে উতলা ধরণী-তল,
অরুণ প্রাতের তরুণ দল।
চল্ রে চল্ রে চল্
চল্ চল্ চল্ ।।

ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত,
বাধার বিন্ধ্যাচল।

নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ,
বাহুতে নবীন বল।
চল রে নও-জোয়ান,
শোন রে পাতিয়া কান
মৃত্যু-তরণ-দুয়ারে দুয়ারে
জীবনের আহবান।
ভাঙ রে ভাঙ আগল,
চল্ রে চল্ রে চল্।
চল্ চল্ চল্ ।।

জন্ম-২৪ মে, ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দ,
(১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ)।
মৃত্যু-২৯ আগস্ট, ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ,
(১২ ভাদ্র, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ)।

পাঠ-১

স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টি

মানুষ হিসেবে জন্মেই আমরা এই সুন্দর পৃথিবীর আলো বাতাস উপভোগ করি। চারপাশে দেখতে পাই গাছ পালা, নদী, চন্দ্র, সূর্য, আকাশ, তারা, পাহাড়, পর্বত, জল ও নক্ষত্র ইত্যাদি। আরো দেখি নানা ধরনের জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, নাম না জানা অসংখ্য প্রাণিকুল।

এসব দেখে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে একটি প্রশ্ন জাগে এসকল কিছু কোথা থেকে এলো? কে এসব সৃষ্টি করেছেন?

আমরা কোথা থেকে এসেছি?

কে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছে?

আমরা আবার কোথায় যাব?

এরকম হাজারো প্রশ্নের মাধ্যমেই একটি উত্তরও আমরা পেয়ে যাই তা হলো, যিনি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন তিনিই স্রষ্টা। অপার তাঁর মহিমা। স্রষ্টা ছাড়া কোনো কিছুই সৃষ্টি করা যায় না। মানুষসহ সকল প্রাণিকুল এবং প্রকৃতিতে আমরা যা কিছু দেখছি সবই স্রষ্টার সৃষ্টি। এই স্রষ্টাকে আমরা কেউ ডাকি, 'ঈশ্বর', কেউ ডাকি 'আল্লাহ', আবার কেউ ডাকি 'গড'। ঈশ্বর স্রষ্টা এবং জীব ও জগত ঈশ্বরের সৃষ্টি।

ঈশ্বর এক না বহু?

সনাতন ধর্মে বলা হয়েছে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" অর্থাৎ ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি সর্বব্যাপী এবং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বিরাজমান। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে বিভিন্ন দেব-দেবী কারা? ঈশ্বর কি তাহলে এক না অনেক? সনাতন ধর্ম মতে অবশ্যই ঈশ্বর বা ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়। বিভিন্ন দেব-দেবী একই পরমাত্মার ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ও অংশ। একই অগ্নি থেকে যেমন শত শত স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় এবং সেই স্ফুলিঙ্গগুলো ঐ অগ্নিরই কণা মাত্র। সনাতন ধর্মে উল্লিখিত দেব-দেবীগণ সেই অনাদি ভগবানের বিভিন্ন বিভূতি বা শক্তির সাকার রূপ।

শাস্ত্র মতে, ঈশ্বরের সৃষ্টিকারী শক্তি হচ্ছেন ব্রহ্মা, পালনকারী শক্তি হচ্ছেন বিষ্ণু, সংহারকারী শক্তি মহেশ্বর, ধন দায়িনী শক্তি লক্ষ্মী, জ্ঞানদায়িনী শক্তি সরস্বতী, সিদ্ধিদাতা শক্তি গণেশ, দুর্গতিহারিণী শক্তি দুর্গা ইত্যাদি। এই বিষয়টি বোঝানোর জন্য আর্য ঋষিগণ বহু পূর্বে বৈদিক যুগেই বলেছেন, "একঃ সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি" অর্থাৎ তিনিই এক। পণ্ডিতগণ তাঁকে বহু বলে উল্লেখ করেছেন।

সনাতন ধর্মীয় শাস্ত্র ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় যে, ঈশ্বর এক, অদ্বিতীয় ও সর্বময় এবং সর্বদেবতা সেই একই ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপের প্রকাশ। এ প্রসঙ্গে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্- এ বলা হয়েছে, "ঈশ্বর জগৎপতি। তিনি পরমেশ্বর, একমাত্র তিনিই স্তবের যোগ্য।" শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে শ্রীভগবান বলেছেন -

"জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥"

অনুবাদ : কেহ কেহ জ্ঞানরূপ যজ্ঞদ্বারা আমার আরাধনা করে। কেহ কেহ অভেদভাবে, কেহ কেহ পৃথকভাবে অর্থাৎ সর্বাত্মক তথা সর্বময় আমাকে নানা দেবতারূপে উপাসনা করে।

ঈশ্বর শুধুমাত্র এক ও অদ্বিতীয় নহেন, তিনিই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র সত্তা। তিনিই সাকার, আবার তিনিই নিরাকার। অরূপ এবং স্বরূপ বহুরূপী সবই। কারণ তিনি ছাড়া আর কিছুরই প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জীবজন্তু প্রতিটি বস্তুতে তিনি অনুপ্রবিষ্ট। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন "হে কৌন্তেয় জলে আমি রস, শশী সূর্যে আমি প্রভা, সর্ব বেদে আমি ওংকার, আকাশে আমি শব্দ, মনুষ্য মধ্যে আমি পৌরুষ রূপে বিদ্যমান আছি।"

ঈশ্বর এক হলে এত দেব-দেবী কেন?

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ের ১৬ থেকে ১৯তম শ্লোকে শ্রী ভগবান বলেছেন, আমি অগ্নিষ্টোম আমি শৌত যজ্ঞ, আমি বৈশ্বদেব আদি স্মার্ত যজ্ঞ, আমি পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি কর্ম, আমি রোগ নিবারক ভেষজ, আমি মন্ত্র, আমি হোমের ঘৃত, আমি অগ্নি এবং আমিই হোমক্রিয়া। আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, বিধাতা ও পিতামহ। আমি জ্ঞেয় বস্তু, শোধনকারী ও ওঙ্কার। আমিই ঋক্, সাম ও যজুর্বেদ। আমি সকলের গতি, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ ও সুহৃদ। আমিই উৎপত্তি, নাশ, স্থিতি, আশ্রয় ও অব্যয় বীজ। হে অর্জুন! আমি তাপ প্রদান করি এবং আমি বৃষ্টি বর্ষণ করি ও আকর্ষণ করি। আমি অমৃত এবং আমি মৃত্যু। জড় ও চেতন বস্তু উভয়ই আমার মধ্যে।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে ঈশ্বর শুধু আমাদের সৃষ্টিকর্তাই নন, তিনিই সবকিছু বা সবকিছুতেই তিনি আছেন। ঈশ্বর সর্বব্যাপী এবং সর্বত্র বিরাজমান। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটিই 'সত্তা' আছে তা হলো ঈশ্বর আর অন্য সবকিছু তাঁরই বহুরূপে প্রকাশ মাত্র। অর্থাৎ সর্বভুতের ন্যায় সর্বদেবতাও একই ঈশ্বরের গুণের বিভিন্নরূপে প্রকাশ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের একাদশ (১১) শ্লোকে শ্রীভগবান বলেছেন,

" যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।
মম বর্তানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥"

অনুবাদঃ হে অর্জুন, যে ব্যক্তি যেভাবে আমাকে ভজনা করে, সে ব্যক্তিকে আমি সেভাবেই তুষ্ট করি।
সহজ কথায় ভগবানের বিভিন্ন শক্তিকে আমরা বিভিন্ন দেব-দেবী রূপে পূজা করে থাকি, তবে ভগবানকে কখনো আমরা বহু হিসেবে চিন্তা করি না। আমাদের চারপাশে আমরা যেসব দেবদেবীর পূজা করি বা পূজা হতে দেখি তা মুলত ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণশক্তির প্রতীককেই পূজা করি। আমরা সনাতন ধর্মাবলম্বীরা যেসকল পূজার্চনা করে থাকি তন্মধ্যে রয়েছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কার্তিক, গণেশ, বিশ্বকর্মা, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতীসহ আরও অসংখ্য দেব-দেবী। এ পূজার্চনার মাধ্যমেও মূলত আমরা ঈশ্বরেরই আরাধনা করি।

ঈশ্বর কোথায় বিরাজমান?

মানুষের মাঝে ঈশ্বর আত্মারূপে বিরাজ করছেন। আত্মাকে দেখা যায় না, ধরা যায় না, কাটা যায় না, আগুনে পোড়ানো যায় না। তাই জীবও ঈশ্বর। জীবের মাঝে অবস্থানকারী ঈশ্বরকে আত্মা বলে। তাই জীবকে সেবা করলে ঈশ্বরেরই সেবা করা হয়। ঈশ্বর যেহেতু সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা তাই ঈশ্বরের সৃষ্টি সকল কিছুকে আমাদের ভালোবাসা উচিত।
স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন-
'বহুরূপে সম্মুখ ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর'।

ঈশ্বর কেন সৃষ্টি করেন?

ঈশ্বর তাঁর নিজের প্রয়োজনেই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডসহ সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা তাঁর নিজ প্রয়োজনেই সৃষ্টি করেছেন। তাঁকে কেউ সৃষ্টি করেননি। তিনি নিজেই নিজের স্রষ্টা। ঈশ্বর তাঁর লীলা প্রকাশের জন্য সৃষ্টি করেছেন। লীলার একটি উদ্দেশ্যে হলো আনন্দ উপভোগ করা। ঈশ্বর ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি করেন, বিষ্ণুরূপে পালন করেন এবং শিবরূপে তিনি ধ্বংস করেন।

কেন আমরা সৃষ্ট জীবকে যত্ন করবো?

ঈশ্বর যেহেতু সকল জীবের মাঝে আত্মারূপে বিরাজমান তাই ঈশ্বরের সৃষ্ট সকল কিছুর প্রতি আমরা যত্নশীল হবো। জীবের সেবা করবো। তবেই ঈশ্বর সন্তুষ্ট হবেন। এজন্যই সনাতন ধর্মাবলম্বীরা ঈশ্বরের সৃষ্ট সকল জীবকেই শ্রদ্ধা করেন এবং ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করেন। ঈশ্বরের সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমে আমাদের কল্যাণ সাধিত হবে।

পাঠ-২

নৈতিক শিক্ষায় পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব

প্রতিটি মানুষের জীবনে শিক্ষা এমন একটি আদর্শের নাম যা ব্যক্তিকে বিনয়ী, নম্র ও ভদ্র করে তোলে। শিক্ষা মানুষের আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটায়। আচরণের এই সাবলীল প্রয়োগ পরিবার থেকেই শিশু প্রথমে শেখে। মা, বাবা, ভাই, বোন, ঠাকুরদা, ঠাকুমা ও অন্যান্য সদস্যদের নিয়েই আমাদের পরিবার। পরিবার ২ প্রকার। যথা-১। একক পরিবার ২। যৌথ পরিবার।

নৈতিক শিক্ষায় পরিবারের ভূমিকা:

একটি শিশু জন্মের পর প্রথম তার মায়ের সান্নিধ্য লাভ করে। মায়ের দুগ্ধ পানের মাধ্যমে তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটে। শিশুটিকে প্রতিপালন করতে গিয়ে মা প্রতিনিয়ত শিশুর সাথে কথা বলেন। ধীরে ধীরে শিশুটি তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কাছ থেকেও আদর যত্ন পেতে থাকে এবং তাদের সাথে তার ভাববিনিময় করতে গিয়ে তাদের মুখের বিভিন্ন কথা শুনে শুনে শিখতে শুরু করে। শিশুর এই ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠার সময় খুব সাবধানে তার সাথে আচরণ করতে হবে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কোনো নেতিবাচক আচরণ, ঝগড়া, কোলাহল ইত্যাদি থাকলে তা শিশুর আচরণের মধ্যে প্রতিফলিত হবে। সেজন্য শিশুকে ছোটো বেলা থেকেই ইতিবাচক ধারণা শিক্ষা দিতে হবে।

- ❖ পিতা-মাতাকে ভক্তি করা এবং তাঁদের আদেশ-নির্দেশ পালন করা;
- ❖ সকলের মতামতকে প্রাধান্য দেয়া;
- ❖ কোনো কিছু ভাগ করে নেওয়ার শিক্ষা দেয়া:
- ❖ মিথ্যা কথা না বলা ও সদাচারী হওয়া;
- ❖ পরধর্ম ও অন্যের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া;
- ❖ শিশুর কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা, সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয়া;
- ❖ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ ও জীবের প্রতি যত্নশীল হওয়া:
- ❖ গুরুজনদের প্রতি গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা:
- ❖ শিশুর মাঝে দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা এবং
- ❖ শিশুর বিকাশকে প্রাধান্য দিয়ে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চার সুযোগ করে দেয়া।

শিশুর জন্মের পর থেকে ০৫ বছর বয়স পর্যন্ত তার মস্তিষ্কের উন্নয়ন দ্রুত ঘটে। এজন্য তার চারপাশে পরিবেশের সাথে সাবলীল যোগাযোগের মাধ্যমে শেখার ও জানার পরিবেশ সৃষ্টি করে দিতে হবে। ফলে পারিবারিক শিক্ষার মাধ্যমে একটি শিশু পরমতসহিষ্ণু, ধৈর্যশীল, নম্র, ভদ্র ও নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হতে সক্ষম হবে। একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে নৈতিকতাসম্পন্ন সুনাগরিক গড়ে তোলার শিক্ষা পরিবার থেকেই শিশুকে নিশ্চিত করতে হবে।

সনাতন ধর্মের ০৫টি লক্ষণ রয়েছে। যথা- অহিংসা, চুরি না করা, সংযমী হওয়া, শুচিতা বা দেহমনের পবিত্রতা এবং সৎপথে থাকা। পরিবার থেকেই যদি শিশুকে এসকল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় তবে শিশুটি নৈতিকভাবে উন্নত চরিত্রের অধিকারী হবে। শিশুকে জীবসেবার বিষয়ে ছোটো বেলা থেকেই শিক্ষা দিতে হবে। প্রতিটি জীবের মাঝেই ঈশ্বর আত্মারূপে বিরাজ করেন। তাই যেকোনো জীবকে সেবা করলে বা দয়া করলে তা ঈশ্বরেরই সেবা করা হয়। পারিবারিক শিক্ষার মাধ্যমেই শিশুকে গুরুজনদের প্রতি গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা শিক্ষা দিতে হবে। পিতা মাতাকে ভক্তি করতে হবে। তাঁদের আদেশ নির্দেশ পালন করতে হবে।

শিক্ষাগুরু হচ্ছে বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাঁর শিক্ষা মনোযোগের সাথে গ্রহণ করতে হবে। পরিবার থেকে কিছু ইতিবাচক শিক্ষা নিয়ে শিশু বিদ্যালয়ের গণ্ডিতে প্রবেশ করে। সেখানে শিশু সমবয়সী ও সমমনা অন্যান্য শিশুদের সাথে মিশতে শুরু করে। ভাষা শিক্ষা, খেলাধুলা, শরীরচর্চা, চারু ও কারু কাজ, ছড়া, গল্প, গান, সামাজিক পরিবেশ ও স্বাস্থ্য এবং নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষা, দেশপ্রেম, সাংস্কৃতিক চর্চা শিশুর পরিমণ্ডল। শিশুর এই গণ্ডিতে একজন শিক্ষকের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষাগুরু তথা শিক্ষক শিক্ষার্থীকে পরিচালনা করতে গিয়ে তার মাঝে যে সুপ্ত প্রতিভা রয়েছে তা নিরূপণ করতে পারেন এবং তাকে সুপথে পরিচালনার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারেন। বিদ্যালয় থেকেই শিশু নৈতিক শিক্ষা লাভের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার শিক্ষা লাভ করে।

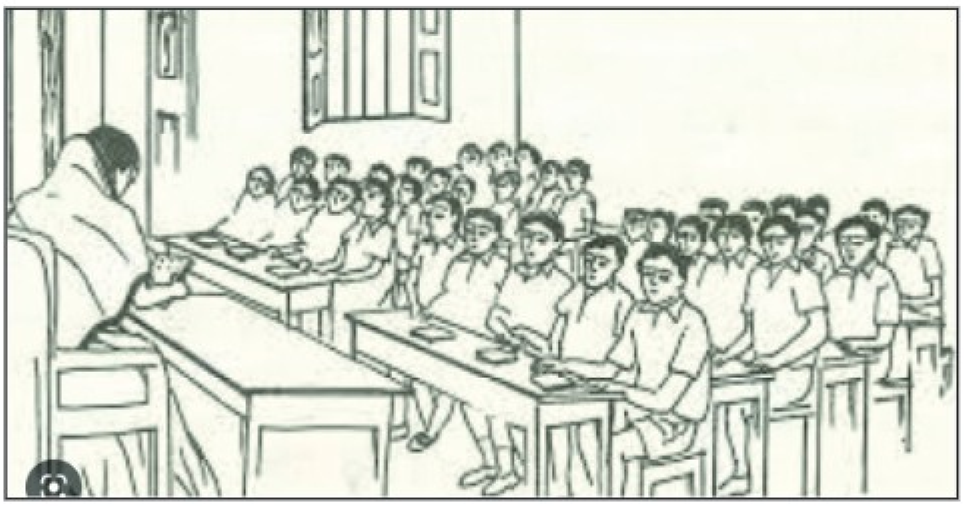

প্রতিটি বিদ্যালয়ে বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালনের মাধ্যমে শিশু দেশ ও মাতৃকার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিখে। বিদ্যালয় শিশুর এই নৈতিক শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে থাকে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিশুকে পাঠ্য বিষয়ের নিয়মিত শিক্ষার অতিরিক্ত হিসেবে এই সকল শৃঙ্খলাবোধ ও করণীয় সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করতে পারেন। পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ইতিবাচক শিক্ষাই শিশুকে নৈতিক চরিত্রের উন্নত সুনাগরিক হতে সাহায্য করবে।

পাঠ-৩

সংস্কৃত বর্ণমালা পরিচিতি

দেবনাগরী বর্ণমালা (স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ)

অংশ-১

সংস্কৃত বা দেবনাগরী লিপি পরিচিতি

स्वरवर्णाः (স্বরবর্ণসমূহ)

अ অ	आ আ	इ ই	ई ঈ	उ উ
ऊ ঊ	ऋ ঋ	ॠ দীর্ঘ ঋ	ऌ ৯	ॡ দীর্ঘ ৯
ए এ	ऐ ঐ	ओ ও	औ ঔ	ॠ (দীর্ঘ ঋ) ও ॡ (দীর্ঘ ৯)-এর ব্যবহার কম।

स्वरवर्ण-परिचयः (স্বরবর্ণ-পরিচয়)

দেখি ও চিনি

ऐ ई अ ओ ऊ उ

ऌ ॡ आ इ ऋ औ ए

ॠ

व्यञ्जनवर्णाः (ব্যঞ্জনবর্ণসমূহ)

क ক	ख খ	ग গ	घ ঘ	ङ ঙ
च চ	छ ছ	ज জ	झ ঝ	ञ ঞ
ट ট	ठ ঠ	ड ড	ढ ঢ	ण ণ
त ত	थ থ	द দ	ध ধ	न ন
प প	फ ফ	ब ব	भ ভ	म ম
य য	र র	ल ল	व ব	श শ
ष ষ	स স	ह হ	ं ং ः ঃ	ँ ঁ क्ष ক্ষ

व्यञ्जनवर्ण-परिचयः (ব্যঞ্জনবর্ণ-পরিচয়)

দেখি ও চিনি

ढ फ भ ध ख ठ ल ष ग

ड छ क झ ब श थ ङ न

च ण ज ञ ट म त स घ

ऽ व प द र ः य ँ क्ष ह

অংশ-০২

स्वरमात्रा-संयोगः (স্বরমাত্রা-সংযোগ)

अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ऋ	ए	ऐ	ओ	औ	ं	ः
	ा	ि	ी	ु	ू	ृ	े	ै	ो	ौ	ं	ः
क	का	कि	की	कु	कू	कृ	के	कै	को	कौ	कं	कः
ख	खा	खि	खी	खु	खू	खृ	खे	खै	खो	खौ	खं	खः
ग	गा	गि	गी	गु	गू	गृ	गे	गै	गो	गौ	गं	गः
घ	घा	घि	घी	घु	घू	घृ	घे	घै	घो	घौ	घं	घः
च	चा	चि	ची	चु	चू	चृ	चे	चै	चो	चौ	चं	चः
छ	छा	छि	छी	छु	छू	छृ	छे	छै	छो	छौ	छं	छः
ज	जा	जि	जी	जु	जू	जृ	जे	जै	जो	जौ	जं	जः
झ	झा	झि	झी	झु	झू	झृ	झे	झै	झो	झौ	झं	झः
ट	टा	टि	टी	टु	टू	टृ	टे	टै	टो	टौ	टं	टः
ठ	ठा	ठि	ठी	ठु	ठू	ठृ	ठे	ठै	ठो	ठौ	ठं	ठः

ड	डा	डि	डी	डु	डू	डृ	डे	डै	डो	डौ	डं	डः
ढ	ढा	ढि	ढी	ढु	ढू	ढृ	ढे	ढै	ढो	ढौ	ढं	ढः
ण	णा	णि	णी	णु	णू	णृ	णे	णै	णो	णौ	णं	णः
त	ता	ति	ती	तु	तू	तृ	ते	तै	तो	तौ	तं	तः
थ	था	थि	थी	थु	थू	थृ	थे	थै	थो	थौ		

অংশ-০৩

संयुक्तवर्नाः (সংযুক্ত বর্ণসমূহ)

य-योगः	क्य ক্য	ख्य খ্য	ग्य গ্য	घ्य ঘ্য	च्य চ্য	छ्य ছ্য	ज्य জ্য	झ्य ঝ্য	ट्य ট্য	ठ्य ঠ্য	ड्य ড্য
	द्य দ্য	ध्य ধ্য	न्य ন্য	प्य প্য	फ्य ফ্য	व्य ব্য	भ्य ভ্য	म्य ম্য	ण्य ণ্য	त्य ত্য	थ्य থ্য
	वाक्यम् काव्यम् सत्यम् मिथ्या राज्यम्										

ल-योगः	क्ल ক্ল	ग्ल গ্ল	प्ल প্ল	ब्ल ব্ল	म्ल ম্ল	ल्ल ল্ল	श्ल শ্ল	स्ल স্ল	ह्ल হ্ল
	क्लेशः ग्लानिः म्लानः श्लोकः पल्ली								

र-योगः	क्र ক্র	ग्र গ্র	घ्र ঘ্র	ज्र জ্র	ट्र ট্র	त्र ত্র	द्र দ্র	ध्र ধ্র	प्र প্র	ब्र ব্র	भ्र ভ্র	म्र ম্র
	चक्रम् प्रभुः व्याघ्रः भ्रमः स्रष्टा											

न-योगः	क्न ক্ন	ग्न গ্ন	घ्न ঘ্ন	त्न ত্ন	ध्न ধ্ন	न्न ন্ন	प्न প্ন	भ्न ভ্ন	श्न শ্ন	स्न স্ন	ह्न হ্ন
	अग्निः अन्नम् स्नानम् विघ्नः स्वप्नः										

ण-योगः	ण्ण ণ্ণ	ष्ण ষ্ণ	ह्ण হ্ণ
	विषण्णः विष्णुः कृष्णः अपराह्णः		

व-योगः	क्व ক্ব	ग्व গ্ব	ज्व জ্ব	ण्व ণ্ব	त्व ত্ব	द्व দ্ব	ध्व ধ্ব
	स्व স্ব	ह्व হ্ব	ल्व ল্ব	श्व শ্ব	ष्व ষ্ব	प्व প্ব	म्व ম্ব
	स्वर्गः ध्वनिः दिग्विजयः द्विजः त्वक्						

म-योगः	क्म ক্ম	ग्म গ্ম	त्म ত্ম	द्म দ্ম	ध्म ধ্ম	न्म ন্ম	क्ष्म ক্ষ্ম	ल्म ল্ম	श्म শ্ম	ष्म ষ্ম	स्म স্ম	ह्म হ্ম
	आत्मा जन्मः वाग्मी पद्मम् ब्रह्म											

रेफ-योगः	र्क র্ক	र्ख র্খ	र्ग র্গ	र्घ র্ঘ	र्त র্ত	र्थ র্থ	र्द র্দ	र्ध র্ধ	र्म র্ম
	अर्कः मुर्खः अर्घः आर्तः अर्थः तीर्थम् धर्मः								

व्यञ्जनद्वययुक्ताः (দুইটি ব্যঞ্জনবর্ণযোগ)

ग्द গ্দ	च्छ চ্ছ	ज्झ জ্ঝ	ट्ट ট্ট	त्थ ত্থ	द्ध দ্ধ	ध्व ধ্ব	ब्ध ব্ধ	ग्ध গ্ধ	स्त স্ত	ज्ञ জ্ঞ
ल्प ল্প	श्च শ্চ	श्छ শ্ছ	ष्क ষ্ক	प्प প্প	ष्ट ষ্ট	ष्ठ ষ্ঠ	ष्प ষ্প	ष्फ ষ্ফ	स्क স্ক	स्ख স্খ
द्र দ্র	क्त ক্ত	क्ष ক্ষ	ल्क ল্ক	ञ्ज ঞ্জ	ज्ञ জ্ঞ	क्त ক্ত	श्र শ্র	च्च চ্চ	ङ्ग ঙ্গ	द्द দ্দ
न्ध ন্ধ	स्फ স্ফ	न्द ন্দ	ङ्ख ঙ্খ	ड्ड ড্ড	ङ्क ঙ্ক	स्त স্ত	स्थ স্থ	स्प স্প	ङ्घ ঙ্ঘ	प्त প্ত
स्कन्धः शङ्खः ज्ञानं ध्वंस अङ्गः कल्किः दुग्धः										

व्यञ्जनत्रययुक्ताः (তিনটি ব্যঞ্জনবর্ণযোগ)

न्ध्य ন্ধ্য	क्ष्म ক্ষ্ম	स्थ्य স্থ্য	र्श्व র্শ্ব	क्ष्ण ক্ষ্ণ	क्त्व ক্ত্ব	ज्ज्व জ্জ্ব	न्त्व ন্ত্ব	च्छ्र চ্ছ্র	त्त्व ত্ত্ব	ष्ट्र ষ্ট্র	र्त्म র্ত্ম
सूक्ष्मं उज्ज्वल स्वास्थ्यं तत्त्वम् उष्ट्रः											

अनुस्वार-विसर्गयोगः (অনুস্বার-বিসর্গযুক্ত শব্দ)

संसारः সংসারঃ	दुःखम् দুঃখম্	हंसः হংসঃ	संस्कृतम् সংস্কৃতম্

युक्ताक्षर-प्रयोगाः (যুক্তাক্ষর-প্রয়োগ)

अङ्कः অঙ্কঃ	काञ्चनम् কাঞ্চনম্	अन्धः অন্ধঃ	पन्थाः পন্থাঃ	अङ्गम् অঙ্গম্	अण्डम् অণ্ডম্	आनन्दम् আনন্দম্
दुग्धम् দুগ্ধম্	सुरक्षा সুরক্ষা	मिष्टम् মিষ্টম্	मन्त्रः মন্ত্রঃ	भक्तः ভক্তঃ	उत्थानम् উত্থানম্	स्पर्शः স্পর্শঃ
सम्प्रति সম্প্রতি	सम्भ्रमः সম্ভ্রমঃ	सान्निध्यम् সান্নিধ্যম্	अक्षि অক্ষি	माहात्म्यम् মাহাত্ম্যম্	सम्पन्नः সম্পন্নঃ	अम्बा অম্বা

संख्याः [সংখ্যাসমূহ]

१ (১) एकः (পুং) एका (স্ত্রী) एकम् (ক্লীব)	२ (২) द्वौ (পুং) द्वे (স্ত্রী) द्वे (ক্লীব)	३ (৩) त्रयः (পুং) तिस्रः (স্ত্রী) त्रीणि (ক্লীব)	४ (৪) चत्वारः (পুং) चतस्रः (স্ত্রী) चत्वारि (ক্লীব)	५ (৫) पञ्च
६ (৬) षट्	७ (৭) सप्त	८ (৮) अष्ट	९ (৯) नव	१० (১০) दश

অংশ-০৪ : ব্যাবহারিক

পরিচয় পর্ব

संस्कृत	বাংলা উচ্চারণ	বাংলা অর্থ
मम नाम सन्दीपः।	মম নাম সন্দীপঃ।	আমার নাম সন্দীপ।
भवतः (भवत्याः) नाम किम्?	ভবতঃ (ভবত্যাঃ) নাম কিম্?	আপনার নাম কী?
मम नाम किशोरः।	মম নাম কিশোরঃ।	আমার নাম কিশোর।
भवान् (भवती) कः?	ভবান্ (ভবতী) কঃ?	আপনি কে?
अहम् एकः शिक्षकः।	অহম্ একঃ শিক্ষকঃ।	আমি একজন শিক্ষক।
अहं छात्री।	অহং ছাত্রী।	আমি ছাত্রী।
भवान् कस्यां श्रेण्यां पठति?	ভবান্ কস্যাং শ্রেণ্যাং পঠতি?	তুমি (ছেলে) কোন শ্রেণিতে পড়ো?
भवती कस्यां श्रेण्यां पठति?	ভবাতি কস্যাং শ্রেণ্যাং পঠতি?	তুমি (মেয়ে) কোন শ্রেণিতে পড়ো?
अहं दशम श्रेण्यां पठामि।	অহং দশম শ্রেশ্যাং পঠামি।	আমি দশম শ্রেণিতে পড়ি।
अहं विज्ञानविभागे पठामि।	অহং বিজ্ঞানবিভাগে পঠামি।	আমি বিজ্ঞান বিভাগে পড়ি।
भवतः गृहं कुत्र?	ভবতঃ গৃহং কুত্র?	আপনার বাড়ি কোথায়?
मम ग्रामस्य नाम...।	মম গ্রামস্য নাম...।	আমার গ্রামের নাম ...।
कुशलं किम्?	কুশলং কিম্?	ভালো আছেন তো?

অংশ-০৫

সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে জ্ঞাতব্য

- ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে ব্যবহৃত ভাষা ছিল দুটি- বৈদিক ও লৌকিক। কালক্রমে লৌকিক ভাষা অশুদ্ধ ও ত্রুটিপূর্ণ হয়ে ওঠে। পণ্ডিতগণ এ ভাষাকে ত্রুটিমুক্ত করে সংস্কার করেছিলেন। তাই এ ভাষার নাম হয় সংস্কৃত ভাষা। অতীতে সংস্কৃতই ছিল মানুষের মৌখিক বা কথ্য ভাষা। রামায়ণ-মহাভারতের যুগে মানুষ সংস্কৃত ভাষাতেই কথা বলতো। এখনও ভারতের বেশ কয়েকটি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ সংস্কৃত ভাষাতেই দৈনন্দিন কথা বলেন।
- সংস্কৃতকে দেবভাষা বলা হয়। সংস্কৃত ভাষা যে বর্ণমালায় লেখা হয় তাকে দেবনাগরী লিপি বলা হয়। প্রাচীন মহামূল্যবান শাস্ত্রগুলো সংস্কৃততে রচিত। সনাতন ধর্মের ঐক্য, অখণ্ডত্ব ধরে রাখতে এবং হিন্দুরা বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ হলেও সনাতনী উপাসনা বা প্রার্থনার ভাষা অভিন্নতার স্বার্থে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।
- সংস্কৃতে ৎ-এর পৃথক লিপি নেই। ৎ লেখার সময় ত্ লিখতে হয়। বাংলায় য়, ড়, ঢ়-এর মতো সংস্কৃতে পৃথক অক্ষর নেই। এগুলোর জন্য যথাক্রমে য, ড, ঢ ব্যবহৃত হয়।

অংশ-০৬

শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণবিধি

সংস্কৃত বর্ণমালার সঙ্গে বাংলা বর্ণমালার মিল আছে। তবে সংস্কৃত সকল বর্ণের উচ্চারণ বাংলার মতো নয়। তাই শুদ্ধভাবে সংস্কৃত উচ্চারণ শিখতে হলে নিয়মগুলো জেনে নিতে হবে।

১। সর্বদা স্মরণীয় (হস্ চিহ্ন):

সংস্কৃতে ঠিক যে যে বর্ণ দ্বারা শব্দ গঠিত হয়, প্রতিটি বর্ণকে হুবহু তার মতো করেই উচ্চারণ করতে হয়। যেমন- গীতার ১ম শ্লোকের 'কিমকুর্বত' শব্দটি উচ্চারণ করতে হবে 'কিম্অকুর্বত্অ'। এখানে 'ম' এবং 'ত'-এর উচ্চারণ 'ম্+অ' এবং 'ত্+অ'। কোন বর্ণের শেষে হস্ (্) চিহ্ন না থাকলে সেখানে 'অ' উচ্চারণ থাকবে।

২। সংযুক্ত বর্ণ:

সংযুক্ত প্রতিটি বর্ণের স্বতন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়। যেমন- আত্মা = আত্মা, যজ্ঞ = ইয়জ্ঞ, ব্রহ্ম = ব্রহ্ম, তীক্ষ্ণ = তীক্ষ্ণ, লক্ষ্মী = লক্ষ্মী, কৃষ্ণ = কৃষ্ণ, ধর্মক্ষেত্রে = ধর্মক্ষেত্রে।

৩। বিসর্গ (ঃ):

কোনো পদে যে স্বরের পরে বিসর্গ (ঃ) থাকবে সেই স্বরের স্থান হতে 'অর্ধ হ' (হ্)-এর মতো উচ্চারণ করতে হবে। যেমন- 'মামকাঃ' শব্দটার উচ্চারণ 'মামকাহ্', সঞ্জয়ঃ = সন্জয়হ্, 'দুঃখ' = 'দুহ্খ'।

৪। য ও য-ফলা (্য):

য-এর উচ্চারণ হবে 'ইঅ' বা 'ইয়'-এর মতো। যেমন- 'যম' এর উচ্চারণ হবে 'ইঅম'। এভাবে যুদ্ধ = ইয়ুদ্ধ, কাম্য = কাম্ইঅ, ক্লৈব্যম্ = ক্লৈব্ইঅম্।

৫। ব ও ব-ফলা:

সংস্কৃতে দুইটি 'ব' আছে। বর্গীয় ব (ব)-এর উচ্চারণ বাংলা ভাষার ব-এর মতো। এর ব্যবহার কম। যেমন- ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ। আরেকটি হলো অন্তস্থ ব (ব)। এর ব্যবহারই বেশি। অন্তস্থ ব ও ব-ফলার উচ্চারণ হবে 'উঅ'-এর মতো। যেমন- এবম্ = এউঅম্, বিদ্বান = বিদ্উআন্অ, ত্বাং = তুয়াং।

৬। স, ষ, শ :

দন্ত্য স-এর উচ্চারণ দন্তমূলে, কিছুটা বাংলা 'ছ'-এর কাছাকাছি। দন্ত্য 'স' বর্ণটি বস্তু, অস্ত, সমস্ত, আস্তিক শব্দসমূহের 'স'-এর মতো সর্বদা উচ্চারিত হবে। মূর্ধণ্য ষ-এর উচ্চারণস্থান মূর্ধা অর্থাৎ দন্তমূলের পেছনে খাঁজকাটা অংশে। যেমন- পাষণ্ড, কুষ্মাণ্ড, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি। তালব্য শ-এর উচ্চারণস্থান মূর্ধার পেছনে মসৃণ তালুতে। যেমন- শারদীয়, শশী ইত্যাদি।

৭। র, ড় ও ঢ় :

র-এর উচ্চারণ 'বারি', 'বর' শব্দের 'র'-এর মতো দন্তমূলে। ড়-এর উচ্চারণ বাড়ি, বড়ো শব্দের মতো মূর্ধায়। অপর-দিকে 'ঢ়'-এর উচ্চারণ ব্যূঢ়ং, আষাঢ় শব্দের ঢ়-এর মতো তালুতে।

৮। ন ও ণ :

দন্ত্য ন-এর উচ্চারণ হয় দন্তমূলে। যেমন- নৈনং, নানান, অনেক ইত্যাদি। 'মূর্ধন্য ণ' উচ্চারণ করতে জিহ্বার অগ্রভাগ উল্টিয়ে মূর্ধা স্পর্শ করতে হয়। যেমন- পাণ্ডব, প্রণব, শিষ্যেণ ইত্যাদি।

৯। লুপ্ত অ (ঽ) :

বাংলা লিপিতে সংস্কৃত শ্লোকে মাঝেমধ্যে 'মাত্রাহীন হ' (ঽ) -এর মতো একটা বর্ণ দেখা যায়। একে বাংলা হ-এর মতো উচ্চারণ করলে ভুল হবে। মূলত এটা 'লুপ্ত অ'। 'অ' উচ্চারণ করতে যতটুকু কণ্ঠে জোর দিতে হয়, ঽ উচ্চারণ করতে তার চেয়ে কম জোর দিয়ে সামান্য উচ্চারণ করতে হয়। যেমন- মেঽচ্যুত, সোঽহম্, মাঽমৃতাত্ ইত্যাদি। দেবনাগরী লিপিতে এর রূপ- 'ऽ', माऽमृतात्।

১০। হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বর :

'হ্রস্ব স্বর' হ্রস্ব অর্থাৎ কম চাপ দিয়ে আলতো করে এবং 'দীর্ঘ স্বর' দীর্ঘ অর্থাৎ বেশি চাপ দিয়ে বা একটু টেনে উচ্চারণ করতে হয়। যেমন- অনীক (দীর্ঘ ঈ) = অন্ইইক্অ, চমূম্ (দীর্ঘ ঊ) = চম্উউম্।

অংশ-০৭

ছন্দ

আমাদের শাস্ত্রের শ্লোক ও মন্ত্রগুলো ছন্দবদ্ধ। ছন্দের কাজ বাক্যকে শ্রুতিমধুর করা এবং ভাবগত ও ধ্বনিগত সুষমা উপলব্ধি করতে সহযোগিতা করা। জেনে রাখা ভালো, একবারে উচ্চারণসাধ্য শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশকে বলে- 'অক্ষর (syllable)'। যেমনঃ অগ্নি শব্দে চারটি বর্ণ আছে (অ গ ন ই), কিন্তু অক্ষর আছে দুটি 'অ' এবং 'গ্নি'। আমরা জানি, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত শ্লোক সংখ্যা ৬৪৫টি এবং ত্রিষ্টুপ ছন্দে রচিত শ্লোক সংখ্যা ৫৫টি।

অনুষ্টুপ ছন্দ :

অনুষ্টুপ ছন্দের প্রতিটি শ্লোক ৩২ অক্ষর বিশিষ্ট। শ্লোকে চারটি করে চরণ থাকবে আর প্রতিটি চরণে থাকবে ৮টি অক্ষর। অনুষ্টুপ ছন্দের শ্লোক পাঠ করার সময় প্রত্যেক চরণের ৮ম অক্ষরে বিরাম নিতে হয়। যেমনঃ

"ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে।
সমবেতা যুযুৎসবঃ॥
মামকাঃপাণ্ডবাশ্চৈব ।
কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥" (১/১)

ত্রিষ্টুপ ছন্দ :

অপরদিকে ত্রিষ্টুপ ছন্দের প্রতিটি শ্লোক ৪৪ অক্ষর বিশিষ্ট এবং প্রতি চরণের ১১তম অক্ষরে বিরাম নিতে হয়। যেমনঃ

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়।
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি ॥
যথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণানি।
অন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥" (২/২২)

উল্লেখ্যঃ ং, ঃ, ঁ, ঽ, ৎ (ৎ) এবং ম্ বা হসযুক্ত বর্ণড়এগুলোকে পূর্ণ অক্ষর হিসেবে গণনা করা হয় না। আবার যুক্তাক্ষরে যতগুলো বর্ণই একসাথে যুক্ত থাকুক না কেন, সেটা একটি অক্ষর হিসেবে গণনা করতে হয়।

পাঠ-৪

ঈশ্বরের ঐশ্বর্য

(সনাতন ধর্মের বিভিন্ন দেব-দেবীর পরিচিতি)

দেব-দেবী কী?

ঈশ্বর নিরাকার হলেও মানবকল্যাণে তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হতে থাকেন। ঈশ্বর যখন নিজের কোনো গুণ বা ক্ষমতাকে বিশেষ কোনো আকার বা রূপে প্রকাশ করেন তখন তাঁকে দেবতা বা দেব-দেবী বলে। যেমন-ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, কালী, সরস্বতী প্রভৃতি। হিন্দু অনুসারে আমরা তিন প্রকার দেব-দেবীর পরিচয় পাই।

১। বৈদিক দেবতাঃ যেসকল দেবতার নাম বেদে উল্লিখিত হয়েছে, তাদেরকে বৈদিক দেবতা বলে। যেমন-অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্র, রুদ্র, বরুণ, বায়ু, সোম প্রভৃতি।

২। পৌরাণিক দেবতাঃ যেসকল দেবতার নাম পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে, তাদেরকে পৌরাণিক দেবতা বলে। যেমন-দুর্গা, কালী, গণেশ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি।

৩। লৌকিক দেবতাঃ বেদে বা পুরাণে উল্লেখ নেই, লৌকিকভাবে পূজিত হন, এমন দেবতাকে বলা হয় লৌকিক দেবতা। যেমন শীতলা, মনসা, শনি প্রভৃতি।

আমরা এসকল দেব-দেবীকে পূজা করে থাকি। দেব-দেবীর পূজা করলে ঈশ্বর খুশি হন এবং ভক্তের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন। দেব-দেবী মূলত ঈশ্বরেরই শক্তির প্রকাশ।

বিভিন্ন দেব-দেবীর পরিচিতি ও প্রণাম মন্ত্র

শ্রীশ্রী ব্রহ্মা

ব্রহ্মা ঈশ্বরের একটি রূপ। ঈশ্বর যেরূপে সৃষ্টি করেন তাঁর নাম ব্রহ্মা। সুতরাং ব্রহ্মা সৃষ্টির দেবতা। সৃষ্টি করা তাঁর কাজ। বিশ্বের সবকিছুই তিনি সৃষ্টি করেছেন। ব্রহ্মা আমাদের দিয়েও অনেক কিছু সৃষ্টি করান। সেসব সৃষ্টির মূলেও রয়েছে ব্রহ্মার কৃপা। ব্রহ্মার চার হাত, চার মুখ। তাঁর বাম দিকের দুই হাতে আছে কমণ্ডলু ও ঘৃত পাত্র। ডান দিকের হাতে আছে ঘি ঢালার চামচ ও অক্ষমালা।

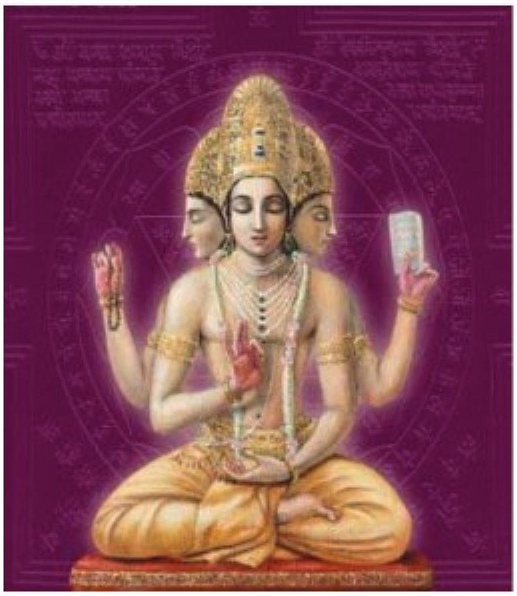

ব্রহ্মার গায়ের রং রক্ত-গৌর লালচে ফর্সা। হংস তাঁর বাহন। লালপদ্ম তাঁর আসন। ব্রহ্মার পূজা করলে আমাদের মঙ্গল হয়।

ব্রহ্মা পূজার নির্দিষ্ট তারিখ নেই। তিথি গণনা করে ব্রহ্মাপূজার দিন ঠিক করা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে পুষ্করতীর্থে ব্রহ্মার মন্দির আছে। সেখানে বিশেষভাবে ব্রহ্মার পূজা হয়। ব্রহ্মা লাল ফুল ভালোবাসেন। তাই ব্রহ্মাপূজায় লাল ফুল দেওয়া হয়। ফুল, ফল, ধূপ-দীপ দিয়ে আমরা ব্রহ্মার পূজা করি। পূজার পর তাঁর প্রণাম মন্ত্র বলে তাঁকে প্রণাম করি।

শ্রীশ্রী ব্রহ্মার প্রণাম মন্ত্র :

ওঁ চতুর্বদন-সম্মস্থ-চতুর্বেদ কুটুম্বিনে।
দ্বিজানুষ্ঠেয় সৎকর্মসাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ॥
অথবা
নমোহস্তু বিশ্বেশ্বর বিশ্বধাম
জগৎসবিত্রে ভগবন্নমস্তে।
সপ্তার্চিলোকায় চ ভূতলেশ
সর্বান্তরস্থায় নমো নমস্তে ॥

সরলার্থ: হে ভগবান বিশ্বেশ্বর, বিশ্বধাম, জগতের সৃষ্টিকারী, তোমাকে নমস্কার। হে পৃথিবীপতি, সপ্ত সূর্যরশ্মির আশ্রম, সকলের অন্তরে অবস্থানকারী, তোমাকে পুনঃপুন নমস্কার।

শ্রীশ্রী বিষ্ণু

বিষ্ণু ঈশ্বরের একটি রূপ। ঈশ্বর বিষ্ণুরূপে আমাদের পালন করেন। তাই বিষ্ণু পালনকর্তা। বিষ্ণুর চার হাত। চার হাতে আছে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। ওপরের বাম হাতে শঙ্খ, ডান হাতে চক্র। নিচের বাম হাতে গদা, ডান হাতে পদ্ম। চাঁদের আলোর মতো বিষ্ণুর গায়ের রং। বিষ্ণুর বাহন গরুড় পাখি। বিষ্ণুপূজার কোনো নির্দিষ্ট তারিখ নেই। যেকোনো দিনে বিষ্ণুপূজা করা যায়। তুলসিপাতা বিষ্ণুর খুব প্রিয়। তাই তুলসিপাতা ছাড়া বিষ্ণুপূজা হয় না। বিষ্ণুর উপাসকদের বলা হয় বৈষ্ণব।

বিষ্ণুর আর এক নাম নারায়ণ। তিনি দুষ্টদের দমন করেন, সৎ ব্যক্তিদের পালন করেন এবং ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা করেন। বিষ্ণুকে স্মরণ করলে এবং তাঁর পূজা করলে পাপ দূর হয়। হৃদয় পবিত্র হয়। সকল পূজার সময় বিষ্ণুর নাম স্মরণ করে তাঁর পূজা করা হয়। আমরা ভক্তিভরে বিষ্ণুর পূজা করি। পূজা করে তাঁর কাছে সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করি। পূজা শেষে তাঁকে নির্দিষ্ট প্রণাম মন্ত্রে প্রণাম করি।

শ্রীশ্রী বিষ্ণুর প্রণাম মন্ত্র :

ওঁ ত্রৈলোক্য পূজিতে শ্রীমন্ সদা বিজয়বর্দ্ধন।
শান্তিং কুরু গদাপাণে নারায়ণং নমোঽস্তুতে ॥
অথবা
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

সরলার্থ: ব্রাহ্মণ্যদেবকে অর্থাৎ বিষ্ণুকে নমস্কার। পৃথিবী, ব্রাহ্মণ এবং জগতের হিতকরী বা মঙ্গলকারী কৃষ্ণকে, গোবিন্দকে বারবার নমস্কার করি।

শ্রীশ্রী শিব

ঈশ্বর অনাদি ও অনন্ত। তাঁর ধ্বংস নেই, বিনাশ নেই। কিন্তু ঈশ্বরের যেকোনো সৃষ্টির আয়ু সীমা আছে। আয়ু শেষ হলে তাঁর ধ্বংস হবেই। মানুষ, পশুপাখি, গাছপালা সবকিছুই ধ্বংস হয়। তবে আত্মা থেকে যায়।

ঈশ্বর আবার নতুন করে সৃষ্টি করেন। ঈশ্বর যেরূপে ধ্বংস করেন তাঁর নাম শিব। শিব আমাদের মঙ্গলের জন্য অশুভকে ধ্বংস করেন। শিবের অনেক নাম- রুদ্র, পশুপতি, মহাদেব, আশুতোষ, ভোলানাথ, বৈদ্যনাথ, নটরাজ ইত্যাদি। শিবের গায়ের রং তুষারের মতো সাদা। তাঁর তিনটি চোখ; তৃতীয় চোখটি কপালে থাকে। তাঁর মাথায় জটা। কপালের ওপরের দিকে বাঁকা চাঁদ। হাতে আছে দুটি বাদ্য যন্ত্র- ডমরু ও শিঙ্গা। ত্রিশূল তাঁর প্রধান অস্ত্র। শিবের পরণে বাঘের চামড়া। ষাঁড় শিবের বাহন।

যেকোনো সময়ে শিবের পূজা করা যায়। তবে বিশেষভাবে শিবপূজা করা হয় ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে। এই তিথিকে শিবচতুর্দশী এবং এ রাত্রিকে শিবরাত্রি বলে। শিবের উপাসকেরা শৈব নামে পরিচিত। বেলপাতা শিবের খুব প্রিয়। তাই শিবপূজায় বেলপাতার অবশ্যই প্রয়োজন। শিবের পূজা করলে অশুভ ধ্বংস হয়। আমাদের মঙ্গল হয়। শিবের পূজা শেষে আমরা তাঁর প্রণাম মন্ত্র পাঠ করে তাঁকে প্রণাম করি।

শ্রীশ্রী শিবের প্রণাম মন্ত্র :

ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃপরমেশ্বর ॥

সরলার্থ: তিন কারণের (সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের) হেতু শান্ত শিবকে প্রণাম। হে পরমেশ্বর তুমিই পরমগতি। তোমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করি।

শ্রীশ্রী দুর্গা দেবী

দুর্গা শক্তির দেবী। সকল শক্তির মিলিত রূপ দুর্গা। তাঁর অনেক নাম, অনেক রূপ। যেমন মহামায়া, ভগবতী, চণ্ডী, মহালক্ষ্মী ইত্যাদি। দুর্গম নামে এক অসুরকে বধ করেন বলে তাঁর নাম হয় দুর্গা। তিনি জীবের দুর্গতি নাশ করেন। এজন্য তাঁর আরেক নাম দুর্গতিনাশিনী। অতসী ফুলের মতো গাঢ় হলুদ দুর্গার গায়ের রং। পূর্ণিমার চাঁদের মতো সুন্দর তাঁর মুখ। তাঁর তিনটি চোখ। এজন্য তাঁকে ত্রিনয়না বলা হয়। একটি চোখ কপালের মাঝখানে। তাঁর মাথার একপাশে বাঁকা চাঁদ। দেবী দুর্গার দশ হাত। তাই তাঁর আরেক নাম দশভুজা। দশ হাতে তাঁর দশটি অস্ত্র। এই অস্ত্র দিয়ে তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

আমাদের ধর্মগ্রন্থ শ্রীশ্রী চণ্ডীতে দেবী দুর্গার কাহিনি আছে। সেখান থেকে জানা যায়, দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করেছেন। তাই তাঁর এক নাম মহিষাসুরমর্দিনী। তিনি আরও অনেক অসুরকে বধ করেছেন। দুর্গাপূজায় শ্রীশ্রী চণ্ডী পাঠ করা হয়। শরৎকালে দুর্গাপূজা হয়। এজন্য দুর্গাপূজাকে শারদীয়া পূজাও বলে। বসন্তকালেও দুর্গাপূজা হয়। একে বাসন্তী পূজা বলা হয়। দুর্গাকে সর্বমঙ্গলা বলা হয়। কারণ তিনি সকলপ্রকার মঙ্গল করেন। দুর্গা দেবী আমাদের শক্তি দেন। সাহস দেন। দুর্গা নাম স্মরণ করলে সকল বিপদ দূর হয়। তাই যাত্রাকালে দুর্গা, দুর্গা বলতে হয়। দুর্গাপূজা শেষে আমরা তাঁর প্রণাম মন্ত্র পাঠ করে তাঁকে প্রণাম করি।

শ্রীশ্রী দুর্গা দেবীর প্রণাম মন্ত্র :

ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণী নমোঽস্তুতে॥

সরলার্থ: হে সর্বমঙ্গলদায়িনী, কল্যাণময়ী, সর্বার্থ প্রদানকারিণী, আশ্রয়-স্বরূপিণী, ত্রিনয়না, হে গৌরী, নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার।

শ্রীশ্রী সরস্বতী দেবী

সরস্বতী বিদ্যার দেবী। শুভ্র তাঁর গায়ের রং। শ্বেতপদ্ম তাঁর আসন। তাঁর এক হাতে পুস্তক আর এক হাতে বীণা। তাঁর হাতে বীণা থাকায় তাঁকে বীণাপাণি বলা হয়। তাঁর বাহন শ্বেত হংস। মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পূজা হয়। বিশেষ করে শিক্ষার্থীরা সরস্বতী পূজা করে। সরস্বতী পূজা করলে বিদ্যালাভ হয়। সরস্বতী পূজা করার মূল কথা হলো জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা। জ্ঞান অর্জনে আগ্রহী হওয়া।

শ্রীশ্রী সরস্বতী দেবীর প্রণাম মন্ত্র :

ওঁ সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তুতে ॥

সরলার্থ: হে মহাভাগ সরস্বতী, বিদ্যাদেবী, কমলনয়না, বিশ্বরূপা, বিশালাক্ষী আমাকে বিদ্যা দাও। তোমাকে নমস্কার।

শ্রীশ্রী লক্ষ্মী দেবী

লক্ষ্মী ধনসম্পদের দেবী। তাঁর বর্ণ গৌর। লক্ষ্মী পদ্মাসনা। লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা। লক্ষ্মীর ডান হাতে পদ্মফুল, বাম হাতে শস্যের ছড়া। ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর আসন আছে। প্রতি বৃহস্পতিবার পাঁচালি পড়ে লক্ষ্মীপূজা করা হয়।

আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা হয়। লক্ষ্মীপূজা করলে আমাদের ধনসম্পদ লাভ হয়। দেবী লক্ষ্মী অত্যন্ত শান্ত ও সুন্দর। তিনি দীন-দরিদ্রের দুঃখ দূর করেন। আমরা লক্ষ্মী পূজা করবো এবং তাঁর মতো শান্ত ও সুন্দর হবো।

শ্রীশ্রী লক্ষ্মী দেবীর প্রণাম মন্ত্র :

ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
সর্বতঃ পাহি মাং দেবী মহালক্ষ্মী নমোঽস্তুতে ॥

সরলার্থ: বিশ্বের সকল গুণ যার মধ্যে বিদ্যমান, যিনি পদ্মের ওপর বসে আছেন, যিনি মঙ্গল লক্ষ্মীরূপী সেই লক্ষ্মী দেবীকে প্রণাম।

শ্রীশ্রী কার্ত্তিক

কার্ত্তিককে বলা হয় শক্তি ও সুন্দরের দেবতা। তিনি দেবতাদের সেনাপতি। যুদ্ধেই তাঁর আসল পরিচয়। গায়ের রং মা দুর্গার মত অর্থাৎ অতসী ফুলের মতো হলদে ফর্সা। দেখতে তিনি খুবই সুন্দর। তাঁর হাতে ধনুক। তাঁর বাহন ময়ূর। কার্তিক মাসের শেষ দিনে বেশ আনন্দের সাথে কার্ত্তিক পূজা হয়।

শ্রীশ্রী কার্ত্তিকের প্রণাম মন্ত্র :

ওঁ কার্ত্তিকেয় মহাভাগে গৌরিহৃদয়নন্দন।
কুমার রক্ষ মাং দেব দৈত্যার্দন নমোঽস্তুতে ॥

সরলার্থ: হে মহাভাগ, গৌরী পুত্র, দৈত্যদলনকারী, কার্ত্তিক দেব, আমাদেরকে রক্ষা করো, তোমাকে নমস্কার।

শ্রীশ্রী গণেশ

গণেশ সিদ্ধি বা সফলতার দেবতা। তাঁর গায়ের রং লাল। তাঁর মাথা হাতির মাথার মতো। তাঁর একটি দাঁত ও একটি শুঁড় আছে। গণেশের পেট আকারে বড়ো। তাঁর গলায় পৈতা থাকে। তাঁর চার হাত। গণেশের বাহন ইঁদুর। গণেশ পূজা করলে সিদ্ধি বা সাফল্য লাভ হয়। সকল দেবতার পুজার শুরুতে গণেশ পূজা করতে হয়। আমরা সকল কাজের শুরুতে গণেশের নাম স্মরণ করি। কারণ, গণেশ যে সফলতার দেবতা।

শ্রীশ্রী গণেশের প্রণাম মন্ত্র :

ওঁ একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদরং গজাননম্।
বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্ ॥

সরলার্থ: যিনি একদন্ত, মহাকায়, লম্বোধর, গজানন এবং বিঘ্ননাশকারী, সেই হেরম্বদেবকে আমি প্রণাম করি।

শ্রীশ্রী কালী

ঈশ্বরের শক্তি রূপের আরেক প্রকাশ হচ্ছে শ্রীশ্রী কালী। তিনি অন্যায়কে ধ্বংস করেন। কালীর মূর্তিকে দেখা যায় যে, তিনি জিহ্বা বের করে আছেন। এখানে লাল জিহ্বাকে সাদা দাঁত দিয়ে কামড়ে রেখেছেন। কালীর চারটি হাত। হাতে অস্ত্র আর গলায় ধ্বংসের পরিচায়ক কাটা মাথার মালা। কালী শক্তির প্রতীক। শক্তিতেই প্রকাশিত হয় শক্তিমান। পায়ের নিচে শিব। শিব মানে মঙ্গল। মহাধুমধামে কালী পূজা করা হয়।

শ্রীশ্রী কালীর প্রণাম মন্ত্র :

ওঁ কালী কালী মহাকালী কালীকে পাপহারিণী।
সর্বপাপ হরে কালী জয়ং দেহি নমোঽস্তুতে ॥

সরলার্থ: হে কালী, তুমি মহাকালী, সকল পাপ হরণ করো, তুমি পাপহারিণী, তোমার জয় হোক, তোমাকে নমস্কার।।

শ্রীশ্রী বিশ্বকর্মা

দেবতাদের মধ্যে যিনি ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় নিমার্ণ কাজ করেন তিনিই হচ্ছেন বিশ্বকর্মা। যাঁরা বিভিন্ন কারিগরি কাজ করে থাকেন বা যন্ত্রপাতি দিয়ে কাজ করেন, তারা বিশ্বকর্মার আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। ভাদ্র মাসের শেষ দিনে বিশ্বকর্মা পূজা হয়। বিশ্বকর্মার চারটি হাত। তাঁর বাহন হাতি।

শ্রীশ্রী বিশ্বকর্মার প্রণাম মন্ত্র :

ওঁ দেবশিল্পিন্ মহাভাগ দেবানাং কার্যসাধকঃ।
বিশ্বকর্মণ্ নমস্তুভ্যং সর্বাভীষ্টফলপ্রদ ॥

সরলার্থ: হে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা, তুমি মহান, দেবগণের কার্যসম্পাদক, সর্ব অভীষ্ট পুরণকারী। তোমাকে প্রণাম।

শ্রীশ্রী শনি দেব

হিন্দুধর্মে অন্যান্য দেবতার মতো শনিদেবও একজন উপাস্য দেবতা। তিনি সূর্য ও ছায়ার পুত্র এবং নবগ্রহের অন্যতম। জীবনে চলার ক্ষেত্রে যেসকল বাঁধা-বিপত্তি আসে, শনিদেব তা দূর করেন। তাই হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বাঁধা-বিপত্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শনিদেবের পূজা করেন। শনিদেবের চার হাত। তাঁর গায়ের রং নীল এবং পোশাকও নীল। তাঁর হাতে তরবারি, তীর ও ধনুক দেখা যায়। তাঁর বাহন শকুন। শনি দেবতার নাম অনুসারে শনিবারে তাঁর পূজা করা হয়।

শনিপূজার উদ্দেশ্য: শনিপূজার উদ্দেশ্য হলো শনিদেবকে সন্তুষ্ট রাখা, বিভিন্ন ধরণের রোগ-পীড়া থেকে মুক্ত থাকা এবং মনের শান্তি বজায় রাখা।

শ্রীশ্রী শনি দেবের প্রণাম মন্ত্র :

ওঁ নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং রবিসূতমহাগ্রহম্।
ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং ত্বং নমামি শনৈশ্চরম্ ॥

সরলার্থ: তোমার দেহ নীলবর্ণ, তুমি সূর্যদেবতার পুত্র, ছায়ার গর্ভে তোমার জন্ম, তোমাকে আমি নমস্কার জানাই।

শ্রীশ্রী শীতলা দেবী

শীতলা লৌকিক দেবী। সাধারণভাবে এ দেবী বসন্ত রোগের জ্বালা নিবারণ করে শীতল করেন বলে শীতলা নামে পরিচিত হয়েছেন। বসন্ত ও চর্ম রোগ থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে শীতলা পূজা করা হয়।

দেবী শীতলাকে ঠাকুরানি, জাগরণী, করুণাময়ী, দয়াময়ী প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। শীতলা কুমারী, মাথায় কুলাকৃতির মুকুট। গর্দভ তাঁর বাহন। সাধারণত শ্রাবণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে দেবী শীতলার পূজা করা হয়। পূজা মন্দিরে বা শীতলা পূজার নির্দিষ্ট স্থানে পুরোহিতের মাধ্যমে শীতলা পূজা করা হয়। এ পূজায় সকল শ্রেণির ভক্ত অংশগ্রহণ করে থাকেন।

শ্রীশ্রী শীতলা দেবীর প্রণাম মন্ত্র :

ওঁ নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীম্।
মার্জ্জনীকলসোপেতাং সূর্পালঙ্কৃতমস্তকম্ ॥

সরলার্থ: গর্দভ বাহন মার্জনী (ঝাঁটা) ও কলস হস্তা শীতলা দেবীকে প্রণাম করি।

পাঠ-৫

যোগাসন ও প্রাণায়াম

যোগ সাধনার ধারণাঃ

যোগ শব্দটি সাধারণভাবে মিলনের অর্থই ব্যক্ত করে। একের সঙ্গে অপরের মিলন বা একত্রিত হওয়া বা তাদের একত্রিত করাকে যোগ বলা হয়। কিন্তু সাধন ক্ষেত্রে এর অর্থ আরও গভীরে গৃহীত। জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সংযোগই যোগ সাধনা। দেহকে সুস্থ ও মনকে শান্ত রাখতে এবং ধর্ম সাধনার ক্ষেত্রে যোগের গুরুত্ব অপরিসীম।

আসন অর্থ স্থির হয়ে সুখে অধিষ্ঠিত থাকা। দেহমনকে সুস্থ ও স্থির রাখার উদ্দেশ্যে যে বিভিন্ন দেহভঙ্গি বা দেহাবস্থান তাকে আসন বলে। আসনে শরীরে দৃঢ়তা আসে, শরীর নিরব ও লঘুভার হয়। একটা স্থির ও সুখকর ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ অবস্থান করলে মানসিক ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। যোগী আসনে দেহকে জয় করে তাকে আত্মার বাহন হিসেবে গড়ে তোলেন। আসন নানাপ্রকার। যেমন পদ্মাসন, সুখাসন, গোমুখাসন, হলাসন ইত্যাদি। এই আসন অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে যোগী নিজ দেহ ও মনকে ঈশ্বর চিন্তায় নিবিষ্ট করার যোগ্যতা অর্জন করেন। নিম্নে দুইটি আসন সম্পর্কে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

পদ্মাসনঃ

প্রথমে পা লম্বা করে বসতে হবে। বাম পা হাঁটু থেকে ভেঙে ডান উরুর ওপর এবং ডান পা একইভাবে বা উরুর ওপর রাখতে হবে। তারপর শিরদাঁড়া সোজা করে বসতে হবে। হাত হাঁটুতে রেখে কনুই একদম সোজা করে বসতে হবে। কিংবা হাত কোলের কাছে রাখা যেতে পারে। অথবা নমস্কারের ভঙ্গিমায় বুকের ওপর রাখতে হবে। আবার জ্ঞানমুদ্রাও ধারণ করা যায়। শিরদাঁড়া সোজা করে বুক উঁচু করে বসতে হবে। চোখ বন্ধ করে ভ্রু অথবা নাকের ডগায় দৃষ্টি রেখে মনকে স্থির করতে চেষ্টা করতে হবে। শ্বাসপ্রশ্বাস ধীরে ধীরে চলবে। পা বদলে দুই বার অভ্যাস করলে ভালো ফল মেলে। যতক্ষণ খুশি এ আসন করা যায়।

দুটি আসনের উপকারিতা: ১। সর্বরোগ দূর হয়। ২। পায়ের পেশী সবল হয়। ৩। পায়ের যাবতীয় ব্যথা যন্ত্রণা দূর করে। ৪। রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ৫। স্মরণশক্তি বাড়ে। ৬। মানসিক শান্তি আসে।

পদ্মাসন

সুখাসন

সুখাসনঃ

আসন করার জন্য একটি সমতল স্থান বেছে নিতে হবে। না নরম, না শক্ত এমন একটি আসন করার উপযোগী পাটি বা ম্যাটে দুই পা ছড়িয়ে বসা যায়। ডান পা ভাঁজ করে বাম উরুর দিকে নিয়ে আসতে হবে। বাম পা ভাঁজ করে ভাঁজ করা ডান পায়ের নিচ দিয়ে বাম উরুর কাছে আনতে হবে। তারপর ডান হাত ডান হাঁটুর উপর এবং বাম হাত বাম হাঁটুর ওপরে রাখতে হবে। শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখতে হবে। পা বদলে অন্তত দুইবার অভ্যাস করতে হবে। এ আসনকে আমরা বাবু হয়ে বসা বলে জানি।

প্রাণায়ামঃ

প্রাণায়াম অর্থ প্রাণের আয়াম। প্রাণ হল শ্বাসরূপে গৃহিত বায়ু আর আয়াম হলো বিস্তার। সুতরাং প্রাণায়াম বলতে বুঝায় শ্বাসপ্রশ্বাসের বিস্তার। অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতিকে নিয়ন্ত্রণ এবং নিজ আয়ত্তে আনাই প্রাণায়াম। প্রাণায়ামে শ্বাসপ্রশ্বাস বিস্তারিত অর্থাৎ দীর্ঘতর করা হয়। কারণ যোগীর আয়ু দিন গণনায় স্থির হয় না, স্থির হয় শ্বাস গণনায়। কতবার তিনি শ্বাস গ্রহণ করলেন তা দিয়েই তাঁর আয়ু পরিমাপ করা হয়। যত বেশি তিনি শ্বাস গ্রহণ করবেন তত বেশি তাঁর আয়ু ক্ষয় হবে। সেই কারণে তিনি ধীরে ধীরে গভীরভাবে ও ছন্দোবদ্ধভাবে শ্বাস গ্রহণ করেন। এইরূপ শ্বাস গ্রহণ করলে শ্বসনতন্ত্র বলিষ্ট হয়, স্নায়ুতন্ত্র শান্ত থাকে এবং কামনা-বাসনা হ্রাস পায়। রেচক, পূরক ও কুম্ভক-এই তিন প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রাণায়াম সম্পন্ন করা হয়। শ্বাস গ্রহণকে বলে পূরক, শ্বাস ত্যাগকে বলে রেচক এবং শ্বাস ধারণকে বলে কুম্ভক।

সহজ প্রাণায়ামঃ

যেকোনো ধ্যানাসনে সোজা হয়ে বসতে হবে। উভয় নাক দিয়ে শ্বাসগ্রহণ করতে হবে। শ্বাসগ্রহণ শেষে মুখ দিয়ে ধীরে ধীরে গভীরভাবে শ্বাস ত্যাগ করতে হবে। এভাবে ২ থেকে ৫ মিনিট করতে হবে। শ্বাসগ্রহণ ও ত্যাগের দিকে মনোযোগ স্থির করতে হবে।

সহজ প্রাণায়ামের উপকারিতাঃ

১. ফুসফুস, পাকস্থলি ও যকৃৎ সবল হয়।
২. চর্মরোগ হয় না।

কপালভাতি প্রাণায়ামঃ

প্রথমে সোজা হয়ে সুখাসন বা পদ্মাসনে বসতে হবে। উভয় নাক দিয়ে কর্মকারদের হাপরের মতো দ্রুত শ্বাস নেয়া ও ছাড়ার মাধ্যমে শ্বাসযন্ত্রে সশব্দে দ্রুত বায়ুপূর্ণ এবং পরক্ষণেই বায়ুশূন্য করতে হবে। এক্ষেত্রে দম নেয়ার চাইতে দম ছাড়া হবে বেশি পরিমাণে এবং খুব জোরের সঙ্গে। দম নেয়া ও ছাড়ার সময় মেরুদণ্ড, বুক ও কাঁধ যতটা সম্ভব স্থির থাকবে এবং তলপেট হাপরের মতোই ভিতরে বাইরে দ্রুত আসা যাওয়া করবে।

কপালভাতি প্রাণায়ামের উপকারিতাঃ

১. সহজে সর্দি হয় না, কফ্ দোষ বিনষ্ট হয়।
২. সাইনাসের জন্য খুবই উপকারী।
৩. হৃদযন্ত্র সবল হয়, পেটের মেদ কমায়, হজমশক্তি বাড়ে এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে।

➢ বি.দ্রঃ প্রতিটি আসন ও প্রাণায়াম শেষে শবাসনে ১ মিনিট বিশ্রাম নিতে হবে।

পাঠ-৬

নিত্যকর্ম ও ত্রিসন্ধ্যা

ত্রিসন্ধ্যা বা নিত্য কর্ম করার নিয়মঃ

নিত্যকর্ম ধর্মচর্চার একটি অঙ্গ। ধর্মচর্চা শরীর ও মন সুস্থ থাকতে হয়। নিত্যকর্মের ফলে শরীর ও মন সুস্থ থাকে। এজন্য প্রতিদিন নিয়ম মেনে কিছু কর্ম করতে হয়। তাকেই বলে নিত্যকর্ম। নিত্যকর্ম, ছয় প্রকার, যথা- ১) প্রাতঃকৃত্য, ২) পুর্বাহ্নকৃত্য, ৩) মধ্যাহ্নকৃত্য, ৪) অপরাহ্নকৃত, ৫) সায়াহ্নকৃত্য ও ৬। রাত্রিকৃত্য।

নিত্যকর্ম করার নিয়মঃ

1| c¦ZtKZ¨: সূর্যোদয়ের কমপক্ষে আধঘণ্টা আগে ঘুম থেকে উঠতে হবে। (একে বলে ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠা) ঘুম থেকে উঠে হাত মুখ ধুয়ে যাদের দীক্ষা হয়েছে তারা গুরু স্মরণ করে গুরু প্রদত্ত মন্ত্র এবং যাদের দীক্ষা বা (মন্ত্র) হয়নি তারা ঈশ্বরের যেকোনো নাম জপ করবে কমপক্ষে ১০৮ বার করে যতবার বেশি করা যায় জপ করবে এবং ঈশ্বরের স্মরণ ও মনন করবে। এটা হলো ১ম (সন্ধ্যা)। এটা সূর্য উঠার আধ ঘণ্টা পর পর্যন্ত চলতে পারে। ঈশ্বরের যে কোনো নামে তাঁকে ডাকতে হবে একেই বলে জপ। আর তাঁর রূপকে চিন্তা করাকেই বলে ধ্যান।

2| ce¦ŋtKZ¨: এভাবে স্নানের পর দুপুরে বা তার একটু আগে পরে একইভাবে কমপক্ষে ১০৮ বার করে যতবার পারবে জপ করবে। এভাবে ঈশ্বরের নাম করা ও তাঁর স্মরণ করা হল ২য় সন্ধ্যা।

3| ga¨vŋKZ¨: দুপুরের কাজ খাওয়া ও বিশ্রাম; এটাই মধ্যাহ্নকৃত্য।

4| Aci¦ŋKZ¨: দুপুরের পর এবং সন্ধ্যার পূর্ব যে কাজ করা হয় তাকেই বলে অপরাহ্নকৃত্য। এ সময় খেলাধুলা, ব্যায়াম বা ভ্রমণ করলে শরীর ভালো থাকে।

5| m¦qvŋKZ¨: এভাবে সূর্যাস্তের অর্ধ ঘণ্টা পর থেকে শোবার আগে যে কোনো সময়, তবে সন্ধ্যা আরতির সময় করা বেশী উত্তম। একই ভাবে ১০৮ বা অধিক বার তাঁর নাম জপ ও তাঁকে স্মরণ করতে হবে। এটি হল ৩য় সন্ধ্যা। এভাবে ত্রিসন্ধ্যা করা একান্ত কর্তব্য।

6| iw¦ÎKZ¨: সন্ধ্যার পর রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত কাজকে বলে রাত্রিকৃত্য। এসময় অধ্যয়ন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ করা হয়। রাতের আহার গ্রহণ করতে হয়। তারপর ভগবানের এক নাম 'পদ্মনাভ' বলে ঘুমাতে হয়।

যাদের দীক্ষা হয়েছে তারা তার গুরু নির্ধারিত ইষ্ট মন্ত্র জপ করবেন। যাদের দীক্ষা হয়নি তারাও ঈশ্বরের যে কোনো নামে জপ করতে পারেন যেমন-ওঁ (অউম্), ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, রাম, কৃষ্ণ, হরি নারায়ণ, ইত্যাদি যে কোনো নামে ডাকবেন। সঙ্গে গায়ত্রী মন্ত্র জানা থাকলে সেটি পারলে জপ করা যায়।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ।
তৎসবিতুর্বরেণ্যং।
ভর্গোদেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ (ঋগ্বেদ-৩/৬২/১০)

সরলার্থঃ যিনি বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণস্বরূপ, যিনি সৎ-চিৎ-আনন্দ এবং আমাদের বুদ্ধির প্রেরণাদাতা, সেই সদা লীলাময় জগৎ স্রষ্টা পরমেশ্বরের বরণীয় জ্যোর্তিময় তেজকে বা রূপকে আমরা ধ্যান করি। আমরা প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে সর্বদা কল্যাণময় কার্যে নিয়োজিত করেন। সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, পূজার চেয়ে নামজপ বা নাম করা বড়ো, তাঁর চেয়ে ঈশ্বরের ধ্যান করা আরও বড়ো। তাই জপ, ধ্যান অবশ্যই কর্তব্য। তবে বিশেষ দিনে পূজা করা কর্তব্য। জপ ধ্যান সর্বদা কর্তব্য।

দৈনন্দিন নিত্যকর্ম ও আচার পালনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মন্ত্রসমূহ

(ওঁ উচ্চারণ করে মন্ত্র পাঠ শুরু করা উচিত)

ক্রমিক	দৈনন্দিন নিত্যকর্ম		মন্ত্র
০১	সকল কাজ শুরু করার আগে বলতে হয়	:	ওঁ তৎ সৎ।
০২	বাড়ি থেকে রওয়ানা দেওয়ার আগে বলতে হয়	:	ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তুতে ॥ বা 'দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা' ॥ সরলার্থ: হে সর্বমঙ্গলদায়িনী, কল্যাণময়ী, সর্বার্থপ্রদানকারিণী, আশ্রয়-স্বরূপিণী, ত্রিনয়না, হে গৌরী, নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার।
০৩	পিতৃস্তুতি	:	ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম পিতাহি পরমং তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতাঃ ॥ সরলার্থঃ পিতা স্বর্গ, পিতাই ধর্ম, পিতাই পরম তপস্যা। পিতাকে খুশি করলে সকল দেবতা খুশি হন।
০৪	মাতৃপ্রণাম মন্ত্র	:	ওঁ যৎ প্রসাদাৎ জগৎদৃষ্টং পূর্ণকামো যদাশীষা। প্রত্যক্ষ দেবতায়ৈ মে তুভ্যং মাত্রে নমো নমঃ ॥ সরলার্থঃ যাঁর প্রসাদে এ জগতে দেখতে পাচ্ছি, যাঁর আশীর্বাদে সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়, সে মা প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপা। তাই মাকে বার বার নমস্কার জানাই ॥
০৫	রাতের ঘুমানোর সময়	:	ওঁ শ্রী পদ্মনাভায় নমো নমঃ।
০৬	তুলসী গাছে জল দিবার মন্ত্র	:	ওঁ গোবিন্দ-বল্লভাং দেবীং ভক্ত-চৈতন্যকারিণীং। স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং বিষ্ণুভক্তি-প্রদায়িনীং ॥
০৭	তুলসী প্রদক্ষিণ মন্ত্র	:	ওঁ যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ। তানি তানি প্রণশ্যন্তি প্রদক্ষিণ পদে পদে ॥
০৮	তুলসী প্রণাম মন্ত্র	:	ওঁ বৃন্দায়ৈ তুলসী দেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ। কৃষ্ণভক্তিপ্রদে দেবী! সত্যবত্যৈ নমো নমঃ ॥
০৯	বিল্বপত্র (বেলপাতা) চয়ন মন্ত্র	:	ওঁ পুণ্যবৃক্ষ মহাভাগ মালুর শ্রীফল প্রভো। মহেশপূজনার্থায় তুৎপাত্রাণি চিনোম্যহম্ ॥ টিকা-চক্রশূন্য, ছিদ্রহীন এবং বৃন্তযুক্ত ত্রিপত্র সমন্বিত বিল্বপত্র চয়ন করিতে হইবে।
১০	দূর্ব্বা চয়ন মন্ত্র	:	ওঁ মহস্রপরমা দেবী শতমূলা শতাঙ্কুরা। সর্ব্বৎ হরতু মে পাপং দূর্ব্বা দুঃস্বপ্ননাশিনী ॥
১১	তুলসী পাতা চয়ন মন্ত্র	:	ওঁ তুলস্যমৃতজন্মাসি সদত্বং কেশবপ্রিয়া। কেশবার্থে চিনোমিত্বাং বরদা ভব শোভনে ॥ বি:দ্র:-দ্বাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, রাত্রিকাল, স্বায়ংকাল ও সংক্রান্তি দিবসে তুলসীপত্র চয়ন করা যাবে না।

ক্রমিক	দৈনন্দিন নিত্যকর্ম		মন্ত্র
১২	ঘুম থেকে উঠে বিছানায় বসে মন্ত্রপাঠ	:	ব্রহ্মা মুরারি ত্রিপুরান্তকারী ভানুঃ শশী ভূমিসূতো বুধশ্চ। গুরুশ্চ শুক্রঃ শনি রাহু কেতুর্বন্ত সর্বে মম সুপ্রভাতম্॥ সরলার্থঃ ব্রহ্মা , মুরারি (বিষ্ণু), ত্রিপুরান্তকারী (শিব), সূর্য, চন্দ্র, বুধ, গুরু, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু-সকলে আমার প্রভাতটি সুন্দর করুন। অতঃপর ভূমি স্পর্শ করে নিম্ন মন্ত্র বলুন- ওঁ প্রিয়দত্তায়ৈ ভূম্যৈ নমঃ॥ অর্থঃ স্নেহময়ী ও সহিষ্ণুতার প্রতীক ভূমিকে প্রণাম করি।
১৩	জলশুদ্ধি	:	জল পান করা বা কোন সুকাজে ব্যবহার করার পূর্বে উহা নিম্ন মন্ত্রে শুদ্ধ করে নিতে হয়: ওঁ আপো জ্যোতিঃ রসঃ অমৃতম্ ব্রহ্ম ভূঃ ভুবঃ স্বরোম। সরলার্থঃ পরমেশ্বর! এই জল জ্যোতি স্বরূপ, এই জলই রস (আনন্দ) স্বরূপ এবং অমৃত ব্রহ্ম স্বরূপ । এই জল স্থুল, শুষ্ক ও অতিসূক্ষ্ম জগৎ স্বরূপ। অথবা ওঁ গঙ্গে চ যমুনেচৈব গোদাবরী সরস্বতী। নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥
১৪	স্নানমন্ত্র	:	ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাসপুষ্করাণি চ। তীর্থান্যেতানি পূণ্যানি প্রাতঃস্নানকালে ভবন্তিহ॥ সরলার্থঃ প্রভু! পবিত্র কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গা, প্রভাস ও পুস্কর তীর্থের পুণ্য সকল এ স্নানের সময় লাভ হউক।
১৫	খাদ্য গ্রহণ মন্ত্র	:	ওঁ অন্নপতেহন্নস্য নো দেহ্যনমীবস্য শুষ্মি নঃ। প্র-প্রদাতারং তারিষ উর্জং নো দেহী দ্বিপদে চতুস্পদে॥ সরলার্থঃ হে অন্নদাতা প্রভু! তোমার করুণায় এই অন্ন আমাদের রোগনাশক ও পুষ্টিবর্ধক হোক। জগতে অন্ন দানকারীদের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি হোক। সকল দ্বিপদী ও চতুস্পদী প্রাণী অন্ন প্রাপ্য হোক। অথবা, ওঁ শ্রী জনার্দ্দনায় নমঃ।
১৬	কারো সুসংবাদ এর মন্ত্র	:	ওঁ য একবর্ণ বহুধা শক্তি যোগাদ বর্ণান্ অনেকান নিহিতার্থে দধ্যাতি। বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥ সরলার্থঃ যিনি নিরাকার, প্রয়োজনে বহুরূপ ধারণ করেন, আদিতে বিশ্ব যা হতে উদ্ভূত এবং অন্তে বিশ্ব যাতে লীন হয়ে যায় সেই পরম দেবতা আমাদের শুভবুদ্ধি প্রদান করুন। অথবা-হরিবল! হরিবল! হরিবল!
১৭	জন্মসংবাদ শুনলে মন্ত্র	:	কারো জন্ম সংবাদ শুনলে ৩ (তিন) বার বলতে হয়: ওঁ আয়ুস্মান্ ভব॥
১৮	দুঃসংবাদ শুনলে	:	কারো দুঃসংবাদ শুনার সঙ্গে সঙ্গে বলতে হয়: ওঁ আপদং অপবাদশ্চ অপসরঃ॥
১৯	মৃত্যু সংবাদ শুনলে মন্ত্র	:	মৃত্যু সংবাদ শুনলে সঙ্গে সঙ্গে বলতে হয়: ওঁ তস্য আত্মানস্য সদ্গতি ভব। অথবা, দিব্যান, লোকান সঃ গচ্ছতুঃ॥ অথবা (দহেয়ং সর্বগাত্রানি)

ক্রমিক	দৈনন্দিন নিত্যকর্ম		মন্ত্র
২০	মুখশুদ্ধি ও দেহশুদ্ধি মন্ত্র	:	মুখশুদ্ধিঃ ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু (জলসহ) দেহশুদ্ধিঃ
			ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রোবা সর্বাবস্থাং গতোপিবা। যঃ স্মরেৎ পুন্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥ সরলার্থঃ পবিত্র বা অপবিত্র যে কোন অবস্থাতেই (পুন্ডরীকাক্ষং) শ্রীবিষ্ণুর নাম স্মরণ করলে বাহির ও ভিতর পবিত্র হয়ে যায়। সে বিষ্ণুকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।
২১	গুরু প্রণাম মন্ত্র	:	ওঁ অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ সরলার্থঃ যিনি অজ্ঞান-অন্ধকারাচ্ছন্ন (অজ্ঞানরূপ তিমির রোগের দ্বারা অন্ধ) শিষ্যের চক্ষু জ্ঞানরূপ অঞ্জন শলাকা দিয়ে উন্মীলিত করেন, সে গুরুদেবকে প্রণাম। ওঁ অখন্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ সরলার্থঃ যাঁর দ্বারা অখণ্ড মণ্ডলাকার এ চরাচর জগৎ ব্যাপ্ত হয়ে আছে, তাঁর স্বরূপ যিনি দর্শন করিয়ে দেন, সে গুরুদেবকে প্রণাম।
২২	স্নান করার আগের মন্ত্র	:	স্নানের পূর্বে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করে জলে তীর্থ আহবাহন পূর্বক স্নান করতে হবে। ওঁ গঙ্গে চ যমুনেচৈব গোদাবরি সরস্বতী। নর্ম্মদে সিন্ধো কাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥
২৩	বই পড়ার আগের মন্ত্র	:	দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করে পড়া শুরু করতে হবে। ওঁ সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে। বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তুতে ॥ সরলার্থঃ হে মহাভাগ সরস্বতী, বিদ্যাদেবী, কমলনয়না, বিশ্বরূপা, বিশালাক্ষী আমাকে বিদ্যা দাও। তোমাকে নমস্কার।
২৪	একাদশী পারণের মন্ত্র	:	প্রাতঃস্নাত্বা হরিৎ সম্ভত্তা উপবাসং সমর্পয়েৎ। পারনন্তু ততঃ কুর্যাদ ব্রত সিদ্ধেহরিৎ স্মরণং ॥ *প্রাতঃস্নান করে একটু জল হাতে নিয়ে-* ওঁ অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য ব্রতনানেন কেশব। প্রসীদ সুমুখোনাথ জ্ঞান দৃষ্টিপ্রদো ভব ॥ পাঠ পূর্বক জল পান করতে হয়। এরপর স্বাভাবিক খাবার গ্রহণ করে একাদশী পারণ করার বিধান।
২৫	ভাই ফোঁটার মন্ত্র	:	ভাই-এর কপালে দিলাম ফোঁটা,যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা। যমুনা দেন যমকে ফোঁটা, আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা।। বিঃ দ্রঃ ভাইফোঁটা হচ্ছে ভাইবোনের মধুর সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ। অগ্রহায়ণ মাসের ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া তিথিতে বোন ভাই-এর দীর্ঘ জীবন কামনা করে ভ্রাতৃললাটে তিলকের ফোঁটা দেয়।
২৬	বিপদকালে বলতে হয়	:	ওঁ মধুসূদনায় নমঃ! ওঁ মধুসূদনায় নমঃ! ওঁ মধুসূদনায় নমঃ!
২৭	গৃহে প্রবেশকালে বলতে হয়	:	ওঁ বাস্তু পুরুষায় নমঃ ॥

ক্রমিক	দৈনন্দিন নিত্যকর্ম		মন্ত্র
২৮	শৌচাগারে প্রবেশকালে বলতে হয়	:	ওঁ আজ্ঞা কুরু বসুন্ধরা ॥
২৯	কোন কারণে ভীত হলে বলতে হয়	:	রাম! রাম! রাম!অথবা ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু।
৩০	কারো কুকর্ম, নিন্দা, মিথ্যা, কারো সম্পর্কে কুৎসা শুনলে বলতে হয়	:	রাম! রাম! রাম! অথবা ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু।
৩১	বাড়ি থেকে পদব্রজে গমনকালে বলতে হয়	:	কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব ত্রাহি মাং। রাম রাঘব, রাম রাঘব, রাম রাঘব, রক্ষ মাং ॥
৩২	যানবাহনে আরোহণকালে বলতে হয়	:	ওঁ নারায়ণ! ওঁ নারায়ণ! ওঁ নারায়ণ!
৩৩	প্রবাসে যাওয়ার সময় বলতে হয়	:	ওঁ ত্রিবিক্রম! ওঁ ত্রিবিক্রম! ওঁ ত্রিবিক্রম!
৩৪	ঔষধ সেবনকালে বলতে হয়	:	ওঁ বিষ্ণু! ওঁ বিষ্ণু! ওঁ বিষ্ণু!
৩৫	রোগে আক্রান্ত হলে বলতে হয়	:	ওঁ প্রসীদ পরমানন্দ প্রসীদ পরমেশ্বর। আধি-ব্যাধি ভূজাঙ্গনে দষ্টং মামুদ্ধর প্রভো ॥
৩৬	যুদ্ধকালে বলতে হয়	:	ওঁ চক্রধর! ওঁ চক্রধর! ওঁ চক্রধর!
৩৭	মৃত্যুকালে বলতে হয়	:	ওঁ নারায়ণ! ওঁ নারায়ণ! ওঁ নারায়ণ!
৩৮	বনপথে গমনকালে বলতে হয়	:	ওঁ নৃসিংহদেব! ওঁ নৃসিংহদেব! ওঁ নৃসিংহদেব!
৩৯	অগ্নি ভয়ে বা আগুনের ভয়ের সময় বলতে হয়	:	ওঁ জলশায়িনম্! ওঁ জলশায়িনম্! ওঁ জলশায়িনম্!
৪০	বিবাহকালে বলতে হয়	:	ওঁ প্রজাপতে! ওঁ প্রজাপতে! ওঁ প্রজাপতে।
৪১	পর্বত গমনকালে বলতে হয়	:	ওঁ রঘুনন্দনম্! ওঁ রঘুনন্দনম্! ওঁ রঘুনন্দনম্!
৪২	কোনো ব্যক্তির সাথে দেখা হলে বলতে হয়	:	দুই হাত জোড় করে বুকের কাছে হাত নিয়ে এসে "নমস্কার"।
৪৩	সর্বকার্যের শেষে বলতে হয়	:	ওঁ শান্তি! শান্তি! শান্তি!
৪৪	পবিত্র হওয়া	:	ক. দুই হাত ভালো করে ধৌত করা। খ. দুই পা ভালো করে ধৌত করা। গ. মুখমন্ডল ধৌত করা। ঘ. মুখের ভিতর জল দিয়ে কুলকুচি করা, নাসা অভ্যন্তর, কর্ণ, বাহ্যাভ্যন্তর জল দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করা। ঙ. মাথার উপর জল ছিটিয়ে তিন বার বলতে হবে ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু ।

ক্রমিক	দৈনন্দিন নিত্যকর্ম		মন্ত্র
৪৫	গায়ত্রী মন্ত্র	:	ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎ সবিতুর্বরেণ্যং। ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ (ঋগ্বেদ-৩/৬২/১০) সরলার্থঃ যিনি বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণস্বরূপ,যিনি সৎ-চিৎ-আনন্দ এবং আমাদের বুদ্ধির প্রেরণাদাতা, সেই সদা লীলাময় জগৎ স্রষ্টা পরমেশ্বরের বরণীয় জ্যোর্তিময় তেজকে বা রূপকে আমরা ধ্যান করি। আমরা প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে সর্বদা কল্যাণময় কার্যে নিয়োজিত করেন।
৪৬	সূর্য প্রণাম মন্ত্র	:	ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ॥ সরলার্থঃ কশ্যপের পুত্র, জবা ফুলের মতো রক্তবর্ণ, মহাদ্যুতিময়, অন্ধকার দূরকারী, সর্বপাপ বিনাশকারী সূর্যকে আমি প্রণাম জানাই।
৪৭	মহামন্ত্র/তারকব্রহ্ম নাম	:	হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
৪৮	শ্রীশ্রী কৃষ্ণ প্রণাম মন্ত্র	:	ওঁ হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে। গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তুতে ॥ সরলার্থঃ হে কৃষ্ণ ! আপনি করুণার সাগর, দীন-বন্ধু, জগদীশ্বর, গোপদের ঈশ্বর, এবং শ্রীরাধা ও গোপিনীদের প্রাণপ্রিয়, আপনাকে প্রণাম করি।
৪৯	পুষ্প শুদ্ধি মন্ত্র	:	"পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে, পুষ্পচয়া বকীর্ণে হুঁ ফট্ স্বাহা" ॥ এই বলিয়া পুষ্পের উপর চন্দন দিতে হবে।
৫০	কর শুদ্ধি মন্ত্র	:	গন্ধ পুষ্প লইয়া "ঐংবং অবস্থায় ফট্" এ মন্ত্রে দুই হস্তে ঘর্ষন করতঃ আঘ্রাণ লইয়া বামদিকে নিক্ষেপপূর্বক গঙ্গাজলের ছিটা দিতে হয়।
৫১	আসন শুদ্ধি মন্ত্র	:	ওঁ অস্য আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কর্মোদেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। হাত জোড় করিয়া ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনাং ধৃতা। ত্বংচ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রমাসনং কুরু।
৫২	ক্ষমা প্রার্থনা মন্ত্র	:	ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ ভবেৎ। পূর্ণং তৎ সর্বং ভবতু ত্বৎপ্রসাদাৎ জগদ্গুরো ॥ সরলার্থঃ এ মন্ত্র পাঠকালে আমার যে যে অক্ষরাদি পরিভ্রষ্ট বা চ্যুত হয়েছে এবং যা যা মাত্রাহীন বা ছন্দপতনাদি ক্রটি হয়েছে, হে জগদ্গুরু ভগবান আচার্যদেব, তোমার কৃপায় সে সমস্তই পূর্ণ হউক।

পাঠ-৭

সনাতন ধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থ পরিচিতি

আমরা জানি যে, ধর্ম গ্রন্থে থাকে ধর্মের কথা। মানুষের কল্যাণের কথা। ঈশ্বরের মাহাত্ম্য, দেব-দেবীর উপাখ্যান, সমাজ ও জীবন সম্পর্কে নানা উপদেশমূলক কাহিনি প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের বিষয়বস্তু। তাই ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলে আমাদের কল্যাণ হয়। হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদ বা বেদসংহিতা। এছাড়াও আছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীশ্রী চণ্ডী, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি। সনাতন ধর্মের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে জানবো।

বেদ

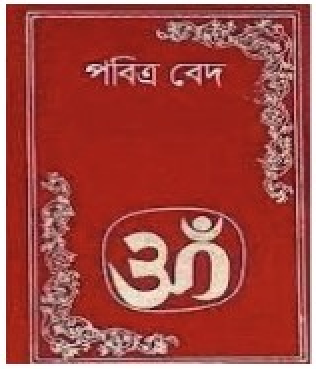

বেদ ঈশ্বরের বাণী। বিভিন্ন মুনিঋষি এই বাণীসমূহ দর্শন করেছেন। সেগুলো লিপিবদ্ধ করে সংহত করেছেন তাই এর নাম হয়েছে সংহিতা বা বেদসংহিতা। বেদ ঋষিদের ধ্যানলব্ধ পবিত্র জ্ঞান। ধ্যানের মাধ্যমে ঋষিগণ সত্য দর্শন করে তাকে ভাবের আবেগে প্রকাশ করেছেন। এজন্যই বলা হয় বেদ সৃষ্ট নয়, দৃষ্ট। অর্থাৎ বেদ কেউ সৃষ্টি করেননি উপলব্ধি করেছেন মাত্র। বেদে বহু দেব-দেবীর বর্ণনা পাওয়া যায়। ঋষিগণ এই দেব-দেবীর মাহাত্ম্য তুলে ধরেছেন। তাদের স্তুতি বা প্রসংশা করেছেন। বেদ প্রথমে একটিই ছিল। পরে ব্যাসদেব এর মন্ত্রগুলোকে চারভাগে ভাগ করেছেন। ফলে বেদ হয়ে যায় চারটি।

বেদ

১। ঋগ্বেদ ২। সামবেদ ৩। যজুর্বেদ ৪। অথর্ববেদ

উপনিষদ

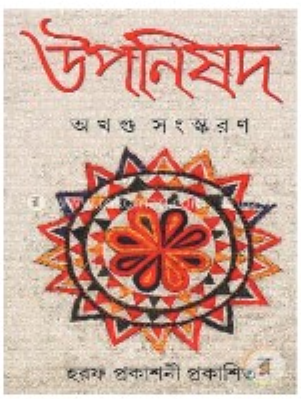

বেদের জ্ঞানকাণ্ড হলো উপনিষদ। এর আলোচ্য বিষয় ব্রহ্ম। ব্রহ্মের আরেক নাম পরমাত্মা। তিনি নিরাকার। প্রত্যেক জীবের মধ্যে তিনি বর্তমান। তাঁকে বলে জীবাত্মা। এ অর্থে জীবও ব্রহ্ম। ব্রহ্মই সবকিছুর মূলে। তাই উপনিষদে ব্রহ্ম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ঈশ, কেন, শ্বেতাশ্বতর, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য উপনিষদ।

পুরাণ

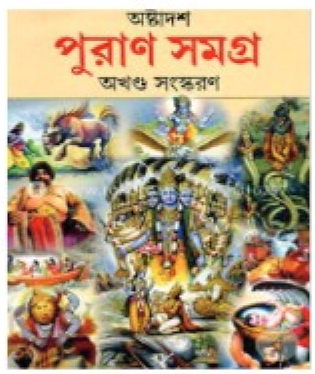

'পুরাণ' শব্দটির সাধারণ অর্থ প্রাচীন। যে ধর্ম গ্রন্থে সৃষ্টি ও দেবতার উপাখ্যান, ঋষি ও রাজাদের বংশ পরিচয় প্রভৃতি আলোচনা করা হয়েছে, তাকে বলে পুরাণ। এসবের মাধ্যমে বেদভিত্তিক হিন্দুধর্ম ও সমাজের নানা কথা বলা হয়েছে। পুরাণ একটি নয়, অনেকগুলো। মহাভারতের রচয়িতা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব পুরাণসমূহেরও রচয়িতা। গল্প বলার ছলে পুরাণগুলো রচিত। সে গল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্মজীবন ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়া।

মূল পুরাণ ১৮টি। এই আঠারোটি পুরাণ হচ্ছে (১) ব্রহ্ম পুরাণ (২) পদ্ম পুরাণ (৩) বিষ্ণু পুরাণ (৪) শিব পুরাণ (৫) ভাগবত পুরাণ (৬) নারদ পুরাণ (৭) মার্কণ্ডেয় পুরাণ (৮) অগ্নি পুরাণ (৯) ভবিষ্য পুরাণ (১০) ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ (১১) বরাহ পুরাণ (১২) লিঙ্গ পুরাণ (১৩) স্কন্দ পুরাণ (১৪) বামন পুরাণ (১৫) কূর্ম পুরাণ (১৬) মৎস্য পুরাণ (১৭) গরুড় পুরাণ (১৮) ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

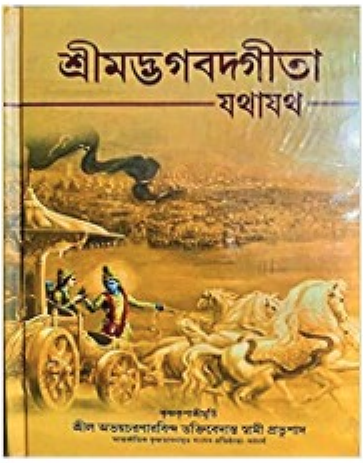

গীতার পুরো নাম শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা। এটি মহাভারতের ভীষ্মপর্বের একটি অংশ। এতে ১৮টি অধ্যায় আছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রাক্কালে বিপক্ষে আত্মীয়স্বজনদের দেখে অর্জুন যুদ্ধ করতে চাইলেন না। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে অনেক উপদেশ দেন। সেটাই গীতা। গুরুত্বের কারণে এটি পৃথক গ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে। গীতায় সবরকমের দুর্বলতা পরিহার করতে বলা হয়েছে। ঈশ্বরের নামে সকল কর্ম করতে বলা হয়েছে ফলের আশা না করে। একেই বলে নিষ্কাম কর্ম। আত্মার অমরত্বের কথা বলা হয়েছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বার কথা বলা হয়েছে। শ্রদ্ধাবান ও সংযমীরাই জ্ঞান লাভ করেন এ কথা বলা হয়েছে। গীতা হচ্ছে সব শাস্ত্রের সার। তাই এটি হিন্দুদের অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ।

শ্রীশ্রী চণ্ডী

শ্রীশ্রী চণ্ডী হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এটি স্বতন্ত্রভাবে রচিত হয়নি। শ্রীশ্রী চণ্ডী হচ্ছে মার্কণ্ডেয় পুরাণের একটি অংশ। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ৮৩ থেকে ৯৫ পর্যন্ত ১৩টি অধ্যায়ের নাম চণ্ডী। মার্কণ্ডেয় পুরাণের এ অংশটির নাম ছিল দেবী মাহাত্ম্য। চণ্ডীতে সাতশত মন্ত্র আছে, তাই এর আরেক নাম সপ্তশতী। মহাভারতের অংশ হয়েও গীতা যেমন পৃথক গ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে, তেমনি শ্রীশ্রী চণ্ডীও মার্কণ্ডেয় পুরাণের অংশ হয়েও বিষয়বস্তু ও রচনার গুণে আলাদা গ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে। শ্রীশ্রী চণ্ডীতে রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্যের কাহিনী, দেবী মহামায়া, দেবী দুর্গা, দেবী অম্বিকা ও দেবী কালিকার উদ্ভব ও মহিমা বর্ণিত হয়েছে।

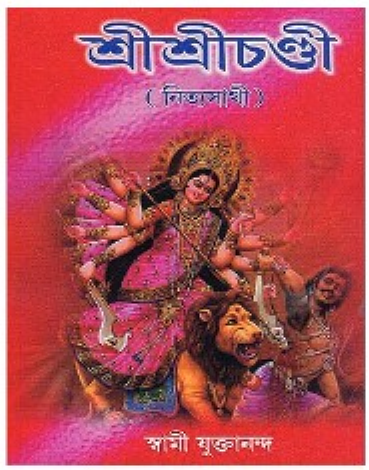

দুর্গাপূজা ও বাসন্তী পূজার সময় বিশেষভাবে চণ্ডী পাঠ করা হয়। গীতার মতো চণ্ডীও একটি নিত্যপাঠ্য গ্রন্থ। পুরাণ মতে, সর্বপ্রথম রাজা সুরথ বসন্তকালে দেবীর আরাধনা শুরু করেন। এজন্য এ পূজার নাম হয় বাসন্তী পূজা। বর্তমানে শরৎকালে যে শারদীয় দুর্গাপূজার আয়োজন করা হয় এটি মূলতঃ অকালবোধন। অপহৃত সীতাকে উদ্ধার করতে রাবণের সাথে যুদ্ধ করার আগে শ্রীরাম চন্দ্র শরৎকালে এ পূজার আয়োজন করেছিলেন। কালক্রমে শরতের এ পূজাই বর্তমানে অধিক গুরুত্ব পাচ্ছে এবং শারদীয় দুর্গোৎসব নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

রামায়ণ

শ্রী শ্রী রামায়ণ হিন্দুদের একটি ধর্মগ্রন্থ। এতে শ্রী রামের জীবনকাহিনি আছে। তাই এর নাম হয়েছে রামায়ণ। মূল রামায়ণ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। রচয়িতা মহামুনি বাল্মীকি। পরে কৃত্তিবাস বাংলা ভাষায় রামায়ণ অনুবাদ করেন।

রামায়ণের কাহিনিকে সাতটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেক ভাগকে বলা হয় কাণ্ড। তাই বলা হয় সপ্তকাণ্ড রামায়ণ। কাণ্ড বা ভাগগুলো হচ্ছে-(১) আদি কাণ্ড, (২) অযোধ্যা কাণ্ড, (৩) অরণ্য কাণ্ড, (৪) কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড, (৫) সুন্দর কাণ্ড, (৬) লঙ্কা কাণ্ড এবং (৭) উত্তর কাণ্ড।

কবিতাকারে সাত কাণ্ডের কথা বলা যায়

আদি কাণ্ডে রামের জন্ম, বিবাহ সীতার।
অযোধ্যাতে বনবাস ত্যাজি রাজ্যভার।
অরণ্য কাণ্ডেতে সীতা হরিল রাবণ।
কিষ্কিন্ধ্যাতে হয় সুগ্রীব মিলন।
সুন্দর কাণ্ডেতে হয় সাগর বন্ধন।
লঙ্কাকাণ্ডে উভয়পক্ষের মহারণ।
উত্তর কাণ্ডেতে হয় কাণ্ডের বিশেষ।
সীতাদেবী করিলেন পাতালে প্রবেশ।

এভাবে বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে এ গ্রন্থটিতে আমাদের সমাজ জীবন, রাজনৈতিক জীবন ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ড থেকে কীভাবে শিক্ষা নিতে পারি তার বর্ণনা আছে। গ্রন্থটি পড়লে এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলে আমরা আমাদের চলার পথের সকল বাঁধা অতিক্রম করে সুন্দরভাবে জীবন অতিবাহিত করতে পারবো। আমাদের প্রত্যেকের উচিত এই গ্রন্থ সম্পর্কে জানা এবং অন্যদেরকেও জানানো।

মহাভারত

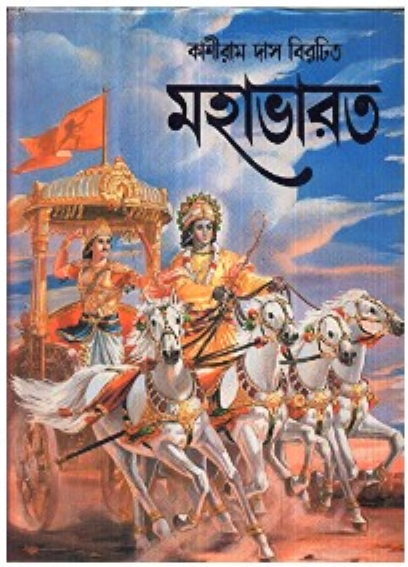

মহাভারত একখানা বিশাল গ্রন্থ। এটি সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেছেন ব্যাসদেব। তাঁর মূল নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। কাশীরাম দাস বাংলা ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করেন। মহাভারতের মূল কাহিনি কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অনেক কাহিনি-উপকাহিনি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রাক্কালে 'একদিকে ধর্ম রক্ষা, অন্যদিকে আত্মীয় স্বজনের প্রতি ভালোবাসা' এ দু'য়ের দ্বন্দ্বে অর্জুন বিষাদগ্রস্থ হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্মসর্মপণ করে তাঁর উপদেশ প্রার্থনা করেন। ভগবান অর্জুনকে বিষাদমুক্ত করার জন্য যে, মহামূল্য দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন, ব্যাসদেব সে উপদেশসমূহ মহাভারতের ভীষ্মপর্বে ২৫ থেকে ৪২ অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মহাভারতের এ অংশটিই 'শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা' বা সংক্ষেপে 'গীতা'। হিন্দুরা রামায়ণের মতো মহাভারতকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে দেখে। তাই কাশীরাম দাস বলেছেন-

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শোন পুণ্যবান।।

মহাভারতে মোট ১৮টি পর্ব আছে

পর্বগুলোর নাম যথাক্রমে	
(১) আদি পর্ব	(১০) সৌপ্তিক পর্ব
(২) সভা পর্ব	(১১) স্ত্রী পর্ব
(৩) বন পর্ব	(১২) শান্তি পর্ব
(৪) বিরাট পর্ব	(১৩) অনুশাসন পর্ব
(৫) উদ্যোগ পর্ব	(১৪) অশ্বমেধিক পর্ব
(৬) ভীষ্ম পর্ব	(১৫) আশ্রমবাসিক পর্ব
(৭) দ্রোণ পর্ব	(১৬) মৌষল পর্ব
(৮) কর্ণ পর্ব	(১৭) মহাপ্রস্থানিক পর্ব এবং
(৯) শল্য পর্ব	(১৮) স্বর্গারোহণ পর্ব।

মহাভারতের মূল কথাই হচ্ছে, সত্যের জয়, অসত্যের পরাজয়। সত্য শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। 'যথা ধর্ম তথা জয়।' কখনই কেবল নিজের সুখ কামনা করতে নেই। সকলকে নিয়ে সুখী হওয়াই মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত। তবেই প্রকৃত সুখী হওয়া যায়। যুধিষ্ঠিরের জীবনেও আমরা তাই দেখতে পাই। আর অধর্ম আচরণ করলে তার বিনাশ হয়। দুর্যোধন তথা কৌরবদের জীবনে তা-ই ঘটেছিল। আমরা সর্বদা সত্য ও ধর্মের পথে থাকবো। এই নৈতিক শিক্ষাই আমরা মহাভারত থেকে পাই। তাই আমরা সবাই মহাভারত পড়বো এবং এর শিক্ষা জীবনে কাজে লাগাবো।

পাঠ-৮

অবতারবাদ

কখনো কখনো পৃথিবীতে খুবই খারাপ অবস্থা বিরাজ করে। অশুভ শক্তির কাছে শুভ শক্তি পরাজিত হয়। মানুষ ধর্মকে ভুলে গিয়ে অধর্মের আশ্রয় নেয়। চারদিকে দুঃখের আর্তনাদ শোনা যায়। এ অবস্থা দেখে ধার্মিক ব্যক্তিদের হৃদয় কেঁদে ওঠে। তাঁরা ঈশ্বরের নিকট দুঃখ মোচনের আকুল প্রার্থনা জানান। তখন করুণাময় ঈশ্বর জগতের কল্যাণের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। তিনি অশান্তি দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দুষ্কৃতকারীদের ধ্বংস করেন, সাধু-সজ্জনদের রক্ষা করেন এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন-

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ (৪/৭)
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ (৪/৮)

সরলার্থঃ পৃথিবীতে যখনই ধর্মের গ্লানি হয় ও অধর্ম বেড়ে যায়, তখনই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি। সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

পৃথিবীতে ঈশ্বরের এরূপ অবতরণকে বলে অবতার। এভাবেই ঈশ্বর অবতাররূপে এসে মানুষের এবং জগতের মঙ্গল করেন।

দশ অবতারের নাম

ভগবান বিষ্ণু বিভিন্ন যুগে দশটি অবতার রূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। যেমন-

১. মৎস্য অবতার

বিশ্ব স্রষ্টা ঈশ্বরই এই জগতের রক্ষাকর্তা। বিভিন্ন সময় সৃষ্ট জগতের কোনোরূপ সংকট উপস্থিত হলে তিনি সংকট মোচন করে থাকেন। সেইরূপ মহাপ্রলয়ের সময় বিষ্ণু মৎস্যরূপ ধারণ করে প্লাবন থেকে জগতকে রক্ষা করেছিলেন। ঐ সময় অবিরাম বর্ষণে সাগর প্লাবিত হয়ে মহাপ্লাবনের সৃষ্টি হয় এবং ধরাতল সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হয়। সেই সময় রাজর্ষি সত্যব্রত (পরবর্তীকালে মনু) এর যাবতীয় ঔষধি, সকলপ্রকার বীজ ও ঋষিগণ সম্বলিত নৌকা মীনরূপী নারায়ণের বিস্তৃত শৃঙ্গের সাথে বেঁধে রাখা হয় এবং এভাবেই মৎস্য অবতারের মাধ্যমে সৃষ্টি রক্ষা পায় ও বেদ সংরক্ষিত হয়। প্রথম প্রাণের সৃষ্টি হয় জলে। জলজ প্রাণীর মধ্যে মৎস্যই শুধু স্রোতের বিপরীতে চলতে পারে। এজন্য সৃষ্টি রক্ষার্থে মৎস্য অবতারের আবির্ভাব।

২. কূর্ম অবতার

প্লাবনে নিমজ্জিত দ্রব্যাদি উদ্ধারের জন্য তথা ক্ষীরোদ সাগর থেকে অমৃত আহরণ করার নিমিত্তে সুরাসুর উভয়পক্ষ মন্দর পর্বত উৎপাটনপূর্বক যখন সমুদ্র মন্থন করতে লাগলেন তখন ভগবান বিষ্ণু বৃহৎ কূর্ম (কচ্ছপ) রূপ ধারণ করে সাগর গর্ভে প্রবেশপূর্বক মান দন্তরূপী মন্দর পর্বতকে পৃষ্ঠে ধারণ করেন। আর দেবতা ও দানবেরা বাসুকী নাগকে রশি করে ঐ পর্বতে জড়িয়ে সমুদ্র মন্থন করে। এভাবে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন দ্রব্যাদি উঠার পর অমৃত উৎপন্ন হয় এবং কূর্মরূপী নারায়ণ ত্রিজগৎ রক্ষা করেন।

৩. বরাহ অবতার

ভগবান বিষ্ণু বরাহ বা শুকর রূপে অবতীর্ণ হয়ে দন্ত দ্বারা জলমগ্না ধরণিকে উদ্ধার করেন। তিনি হিরণ্যাক্ষ নামক ত্রিলোক বিজয়ী দৈত্যের প্রাণ সংহার করে ভূভার হরণপূর্বক জগত রক্ষা করেছিলেন। মহাপ্রলয়ের জলনিমগ্না ধরণীকে উদ্ধারের জন্য বরাহরূপী ভগবান সাগর জলে প্রবেশ করেন এবং নিজের বিশাল তীক্ষ্ণ দন্তের অগ্রভাগ দ্বারা পৃথিবীকে সংলগ্ন করে উত্থিত হন এবং সর্বভূতের বসতির নিমিত্তে জলরাশির ওপরে ধরিত্রীকে স্থাপন করেন। এই কার্য করতে গিয়ে বরাহ অবতারে বাধাদানকারী পরাক্রমশালী দৈত্য হিরণ্যাক্ষকে সংহার করেন।

৪. নৃসিংহ অবতার

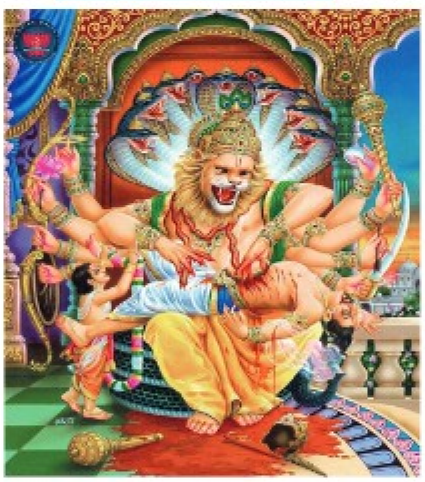

ভগবান বিষ্ণু নৃসিংহ রূপ ধারণ করে হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করেন এবং ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করেন। বরাহ অবতারের হিরণ্যাক্ষকে সংহার করায় তাঁর ভ্রাতা হিরণ্যকশিপু ভ্রাতৃ শোকে দিশেহারা হয়ে যায় এবং প্রজাদের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করে। ক্রমান্বয়ে এই উচ্চভিলাষী দানব, আদিপত্য বিস্তার করার উদ্দেশ্যে উগ্র তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করে দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায়, জগৎবাসীদের রক্ষার্থে ভগবান ভয়ংকর নৃসিংহরূপ ধারণ করে আবির্ভূত হলেন এবং দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর বক্ষ স্বীয় নখ দ্বারা বিদীর্ণ করে তাঁকে সংহার করলেন।

৫. বামন অবতার

ভৃগুশিষ্য বলী ইন্দ্রত্ব প্রাপ্তির জন্য বিশ্বজিৎ যজ্ঞসম্পন্ন করেন। ক্রমান্বয়ে এই বলী দেবতাদের বিভাজনপূর্বক স্বর্গরাজ্য দখল করেন। ত্রিভুবনের অধিশ্বররূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ভগবান এই বলী রাজকে দমনের নিমিত্তে বামনরূপে আবির্ভূত হন এবং বলীকে ছলনা করার উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেন। অতঃপর বামনরূপী ভগবান এক পদ দ্বারা পৃথিবী, দ্বিতীয় পদ দ্বারা স্বর্গ পরিব্যাপ্ত করে তৃতীয় পদ বলীর ইচ্ছায় তার মস্তকে রেখে তাঁকে পাতালে পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে বামন অবতারে স্বর্গোদ্ধারপূর্বক ইন্দ্রকে পুনরায় অধিষ্ঠিত করেন।

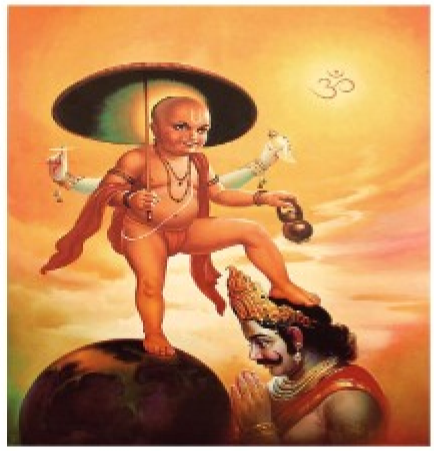

৬. পরশুরাম অবতার

ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে পৃথিবী ক্ষত্রিয়গণের অত্যাচারে ও পাপভারে রসাতলে যাওয়ার উপক্রম হয়। এমন সময় ভগবান পরশুরাম নামে ধরা ধামে অবতীর্ণ হন এবং পৃথিবীকে রক্ষা করেন। পরশুরাম পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করেন। পরশুরাম পিতৃবধজনিত হীন দোষে দুষ্ট ক্ষত্রিয়গণকে বধ করে তাদের রক্তরূপ জলে পৃথিবীকে স্নান করিয়ে পিতৃগণের তৃপ্তি সাধন করেন।

৭. রাম অবতার

ত্রেতাযুগের শেষভাগে ভগবান রামরূপে অবতীর্ণ হয়ে রাক্ষসকুল ধ্বংস করেন এবং পৃথিবীকে পাপমুক্ত করেন। রাম তৎকালীন অযোধ্যার নৃপতি (রাজা) দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। অন্যদিকে রাক্ষস রাজ রাবণ ব্রহ্মার বর লাভের আশায় কঠোর তপস্যায় প্রবিষ্ট হন এবং তপস্যায় ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে অভীষ্ট বর লাভ করেন। রাবণ এইরূপ বর প্রার্থনা করেন "হে প্রভু আমাকে এই বর প্রদান করুন যেন দেব, গন্ধর্ব, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, কিন্নর ও ভূতগণ হতে আমার মৃত্যু না হয়।"ব্রহ্মা "তথাস্তু" বলে দশানন রাবণের অভিলাষ পুরণ করেন। নরভোজী রাক্ষস রাবণ আপন ভোজ্যদ্রব্য জ্ঞানে তাঁদেরকে অবজ্ঞা করে ব্রহ্মা প্রদত্ত বরে কিন্নরে সন্তুষ্ট হন। অতঃপর ব্রহ্মার বরে দর্পিত

রাবণ ক্রমে ক্রমে অত্যাচারী হয়ে দেবগণকেও নিগৃহীত করতে লাগলেন। তখন নররূপী নারায়ণ রাম অবতারে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্তে নানা ঘটনার অবতারণপূর্বক লংকায় উপস্থিত হয়ে রাবণকে সংহার করে দেব ধর্ম রক্ষা করেন এবং সীতাকে উদ্ধার করেন।

৮. বলরাম অবতার

অসুর ও অশুভ শক্তিকে দমন করে ধরায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত করাই ভগবানের অবতারের উদ্দেশ্য। কিন্তু দ্বাপর যুগে আবির্ভূত বলরাম অবতারের বিশেষত্ব আছে। রাম অবতারে লক্ষণ রামের সাথে বনবাসে গিয়ে চৌদ্দ বৎসর বহুবিধ কষ্ট সহ্য করে রাম ও সীতার সেবা করেছিলেন। রাম, লক্ষণের সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন "তুমি রাম অবতারে কনিষ্ঠ হয়ে আমার যেরূপ সেবা করলে, ভাবী অবতারে সেইরূপ তোমার কনিষ্ঠ হয়ে সেবা করবো। দ্বাপর যুগে তাই দুই ভাই রূপে আবির্ভূত হয়ে একে অপরের লীলা সঙ্গী হয়েছিলেন। বলরাম ধেনুকাসুর সহ বিভিন্ন অসুর বধ করেন এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠায় শ্রীকৃষ্ণকে সহায়তা করেন।

৯. বুদ্ধ অবতার

কলিযুগের প্রারম্ভে দৈত্য তথা অসুরগণ পৃথিবীতে একাধিপত্য বিস্তারের জন্য দেবরাজের উপদেশে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করতে থাকে। কিন্তু কু-স্বভাব বশত যজ্ঞাদিকর্মে বলিদান (পশু বলিদান) এর প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগী হয়ে পড়ে এবং প্রকারান্তরে পশু হিংসায় নিবিষ্ট হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায়, অসুরদের মোহমুক্ত করে কুকাজ থেকে নিবারণের নিমিত্তে ভগবান কপিলাবস্তু নামক স্থানে রাজা শুদ্ধোধনের ঘরে বুদ্ধ অবতার হিসেবে আবির্ভূত হন। অহিংসার বাণী প্রচারের মাধ্যমে তিনি জীব হত্যা রোধ ও সাম্যতায় জগত সংসারে শান্তি আনয়ন করেন।

১০. কল্কি অবতার

কলি যুগের শেষে শম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের গৃহে কল্কিদেব অবতাররূপে আবির্ভূত হবেন এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশপূর্বক ধর্ম স্থাপন করবেন। এই অবতার সম্পর্কে এটুকুই জানা যায়।

দশ অবতারের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নেই কেন ? এর কারণ হলো, অন্যান্য অবতার ভগবানের অংশাবতার। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ অবতার। স্বয়ং ভগবান পৃথিবীতে নেমে এসেছেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতপুরাণে বলা হয়েছে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই ভগবান। তাই দশ অবতারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ নেই। এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে একটু ধারণা দেওয়া হলো :

দ্বাপর যুগে পৃথিবীতে যখন ধর্মের গ্লানি এবং অত্যাচারী রাজাদের অত্যাচারে পাপ বৃদ্ধি পেয়েছিল তখন মথুরায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করে যাবতীয় অধর্ম, অন্যায়, অত্যাচারের বিনাশ করে ধর্ম সংস্থাপন করেন।

শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয় "অবতারী" অর্থাৎ ঈশ্বরের পূর্ণরূপ। পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণের নরলীলা বৈচিত্র্যময় উদ্দেশ্য পূরণার্থে তিনি বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। অধিকাংশ হিন্দু নর-নারী বৃন্দাবনের বংশীধারী প্রেমঘন মূর্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেন। কিন্তু মথুরা, কুরুক্ষেত্র ও দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের যে বীর্যঘনমূর্তি, অসুর দমনে যে সংহার মূর্তি, অত্যাচারীর বিনাশে যে রুদ্র মূর্তি ধারণ করেছিলেন তাও আমাদের জানতে হবে এবং তা থেকে শিক্ষার্জন করতে হবে।

চারটি ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণের জীবন লীলা ১২৫ বৎসর। এর মধ্যে প্রথম ১১ বৎসর বৃন্দাবন লীলা, পরবর্তী ১২ বৎসর মথুরালীলা, ২৩ থেকে দেহত্যাগ পর্যন্ত অর্থাৎ ১০৩ বৎসর যাবৎ দ্বারকা ও কুরুক্ষেত্র লীলা। বৃন্দাবনের বাল্য লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণ পুতনা, অঘাসুর, বকাসুর প্রভৃতি দুষ্ট দুর্বৃত্তকে দমন করেছেন। তারপর মথুরা লীলায় কংসকে বধ করে তদীয় পিতা ধার্মিক উগ্রসেনকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছেন।

তৎপরবর্তী কুরুক্ষেত্র ও দ্বারকা লীলায় তিনি মহাযোগী, মহাজ্ঞানী, মহাবীর, মহারাজনীতিজ্ঞ, গীতার প্রবক্তা, কুরুক্ষেত্র মহাসমরের মহানায়ক প্রভৃতি নানা ভূমিকায় লীলা করে সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতিকারীগণের বিনাশ ও ধর্ম সংস্থাপন করেছেন।

আমাদের সনাতন ধর্মীয় সকল নর-নারীর উচিত শ্রীকৃষ্ণের এই জীবন চরিত থেকে জীবনের প্রতিটি ধাপে যখন যেমন বা যেরূপে অবতীর্ণ হওয়া দরকার তাই যেন হই। আজ আমরা আমাদের সেই গৌরব ফিরিয়ে আনি, যে গৌরবে আমরা আমাদের সকল বাঁধা বিপত্তি অতিক্রম করে জীবন সরল ও সুন্দর করতে পারি। আমাদের বর্তমানে অধিকাংশ ধর্মচর্চায় দেখা যায় সাধু না হয়ে সাধু সেজে ধর্মের নামে যা করছি তা বৃহৎ জনগোষ্ঠী অর্থাৎ আমাদের সকল সনাতনীর কল্যাণ হচ্ছে না। তাই আমাদের সকলের মধ্যে গড়ে উঠুক ন্যায় প্রতিষ্ঠার অদম্য আগ্রহ। আমরাও হয়ে উঠি মহাপরাক্রমশালী।

পাঠ-৯

মহাত্মাগণের পরিচিতি

আমাদের ধর্মীয় দৃষ্টিতে প্রতিটি মানুষের মধ্যে ঈশ্বর আছেন। অর্থাৎ "যত্র জীব তত্র শিব"। প্রতিটি জীবের মধ্যে ঈশ্বর বা ঈশ্বরীয় শক্তি থাকলেও সবার ক্ষেত্রে তা প্রকাশ পায় না। কারো কারো মাঝে প্রকাশ পায়। যাঁদের মাঝে ঈশ্বরীয় শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাঁদেরকে আমরা সাধারণ মানুষ থেকে ভিন্ন করে দেখি। অর্থাৎ তাঁদেরকে মহাপুরুষ বা মহামানব হিসেবে আখ্যায়িত করি। তাই সাধারণ মানুষের মধ্য থেকেই অসাধারণ মানুষের প্রকাশ। মনুষ্যকুলে এমন অনেক অনেক অসাধারণ মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়। আমাদের ধর্মীয় গণ্ডির মধ্যস্থিত এমন বিশেষ মহাত্মাগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে তুলে ধরা হলো:

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

জন্ম: ১৪৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমার পূণ্য তিথিতে নবদ্বীপের মায়াপুর অঞ্চলে।

পিতা: পণ্ডিত শ্রী জগন্নাথ মিশ্র। মাতা: শ্রীমতী শচীদেবী।

দেহত্যাগ: ১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দের আষাঢ় মাসে শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের মন্দিরে নিজেকে বিলীন করেন।

তিনিই প্রথমে নিমাই, গৌরাঙ্গ অতঃপর পরবর্তীকালের শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নামে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণ পুরুষরূপে সনাতন ধর্মীয় পরিমণ্ডলে এক গৌরবের আসন লাভ করেন। জগন্নাথ মিশ্রের আদি নিবাস ছিল বাংলাদেশের সিলেট জেলার ঢাকা দক্ষিণে। অল্প বয়সেই নিমাই এর বড় ভাই বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেন এবং তার কিছু দিন পর তাঁর বাবা মারা যান। চতুষ্পাঠীর পড়া শেষে নিমাই নিজেই টোল খুলে বসেন। বিবাহিত জীবনে তিনি প্রথমে বল্লভ আচার্যের কন্যা লক্ষ্মী দেবীকে বিবাহ করেন। লক্ষ্মীদেবীর সর্পাঘাতে মৃত্যু হলে সনাতন পণ্ডিতের মেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করেন। গয়াতে পিণ্ড দান করতে গিয়ে তাঁর ভেতর এক পরিবর্তন আসে। সে পরিবর্তনের ধারায় তিনি সংসার ত্যাগ করেন। মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসী কেশব ভারতীর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে তাঁর কর্মময় সন্ন্যাস জীবনে মানব কুলের মাঝে রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমলীলা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিয়ে ১৫৩৩ সালের আষাঢ় মাসের একদিন দুপুর বেলায় এক দিব্যভাবের পরম আবেশে বিভোর হয়ে প্রভু আপন মনে জগন্নাথ দেবের মন্দিরে গিয়ে দেবী কোঠায় উঠে পড়লেন। এমন সময় মন্দিরের অন্তঃপুরের দ্বার বন্ধ হয়ে গেলে তিনি নিজেকে অন্তর্হিত করেন।

গৌড়ীয় মঠ ও ইসকনসহ আরও অনেক সংগঠন তাঁর আদর্শের কথা প্রচার করে চলেছে। বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুর নির্দেশমত চলতে চেষ্টা করেন। আমাদের এই দেশে বর্তমানে তাঁর মূলবাণী ১৬ নাম ৩২ অক্ষর (হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।) নামযজ্ঞের মাধ্যমে বহুলভাবে প্রচারিত হচ্ছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর কয়েকটি উপদেশ :

১. জীবের হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তি উদয়ের মূল কারণ সাধুসঙ্গ। এই সাধু সঙ্গের দ্বারা কৃষ্ণ প্রেমের উদয় হয়। ভক্তিমার্গ সাধনের এইটিই প্রধান অঙ্গ।

২. যা থেকে চিত্ত অতিশয় স্নিগ্ধ হয় এবং যার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে অতিশয় মমতা উৎপন্ন হয় সেই ঘনীভূত ভাবকেই প্রেম বলা হয়।

৩। সমস্ত মন্ত্রের সারনাম হচ্ছে -

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যাথা ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

জন্ম: বাংলা ১২৪২ বঙ্গাব্দের ৬ই ফাল্গুন, বুধবার শুক্লা দ্বিতীয়ার ব্রহ্মমুহূর্তে, হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন।

বাবা: শ্রী ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। মা: শ্রীমতী চন্দ্রমনি দেবী।

দেহত্যাগ: ১২৯৩ বঙ্গাব্দের ৩১শে শ্রাবণ।

৮ বৎসর বয়সেই আনুড় গাঁয়ে বিশালাক্ষী দর্শনে ভাবাবেশে বাহ্য জ্ঞান হারিয়েছিলেন। বাল্যকালে নাম ছিল গদাধর। গঙ্গার পূর্বকূলে দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মন্দির বা কালীমন্দিরের পূজার্চনার দায়িত্ব পালনের মাঝ দিয়ে তিনি মা কালীর দর্শন লাভে ধন্য হন। এরপর, বৈষ্ণবমতে, বেদান্তমতে ও অন্যান্য ধর্মমতে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন এবং জগতের মানুষের জন্য তাঁর উপলব্ধ জ্ঞান প্রচার করার জন্য তাঁর প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দকে নির্দেশ দেন। তিনি সারদা দেবীকে বিবাহ করেন কিন্তু তাঁকে মাতৃ জাতির মর্যাদায় সমাসীন করে সমাজে নারী জাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

বর্তমানে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক গঠিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন' তাঁর আদর্শের বাণী প্রচার করছে। ঢাকার শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনসহ আরও অনেক কেন্দ্র আমাদের দেশে এই মহাপুরুষের আদর্শ প্রচারে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এর কয়েকটি উপদেশ :

১। আন্তরিক হলে সব ধর্মের ভিতর দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।

২। তেল হাতে মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গতে হয়। তা না হলে আঠা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ করে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।

৩। ছাদের ওপর উঠতে হলে মই, বাঁশ, সিঁড়ি ইত্যাদি নানা উপায়ে যেমন উঠা যায়, তেমনই এক ঈশ্বরের কাছে যাবার অনেক উপায় আছে। প্রত্যেক ধর্মই এক একটি উপায়।

৪। বাঘের ভেতরেও ঈশ্বর আছেন সত্য বটে, কিন্তু বাঘের সম্মুখে যাওয়া উচিত নয়। তেমনই কু-লোকের মধ্যেও ঈশ্বর আছেন সত্য, কিন্তু কু-লোকের সঙ্গ করা উচিত নয়।

৫। ধ্যান করবে মনে, কোণে, বনে। ঈশ্বরচিন্তা যত লোকে টের না পায় ততই ভাল।

শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী

জন্ম: ১১৩৭ সালে এবং ইংরেজি ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে ভারতের চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাতের কাছাকাছি কচুয়া গ্রামে।

বাবা: শ্রী রামকানাই ঘোষাল।

মা: শ্রীমতী কমলা দেবী।

দেহত্যাগ : ১২৯৭ সালের ১৯শে জ্যৈষ্ঠ।

বাবা রামকানাই এর ঐকান্তিক ইচ্ছায় মায়ের সম্মতিতে উপনয়ন শেষেই ভগবান গাঙ্গুলীর সাথে তাঁর গৃহত্যাগে বন্ধু বেনীমাধবও সঙ্গী হয়েছিল। সুদীর্ঘদিন পাহাড় পর্বতে সাধনা করার পর গুরুর আদেশে তিনি সমতল ভূমির মানুষের কল্যাণে নেমে আসেন এবং এক সময় মেঘনার ধারে বারদী গ্রামের এক বট গাছের তলায় অবস্থানকালে ভক্তের আগমনের মাঝ দিয়ে ভক্তদের চেষ্টায় বারদীর শ্মশান ঘাটে আশ্রম করে থেকে যান। বহু অলৌকিক লীলা আর মানবকুলের কল্যাণ সাধনের মধ্য দিয়ে ১২৯৭ সালের ১৯শে জৈষ্ঠ্য ধ্যান সমাধিস্থ হয়ে তিনি দেহত্যাগ করেন। দেশের বহু লোকনাথ আশ্রম আজ তাঁর আদর্শের কথা প্রচার করছে। এক্ষেত্রে ঢাকার স্বামীবাগস্থ 'শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রম ও মন্দির' এবং বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার আশ্রমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর কয়েকটি উপদেশ :

১। যে কর্ম মনে তাপের সৃষ্টি করে তাই পাপ। যে কর্মের মধ্যে দিয়ে আত্মসচেতন বা শক্তির ভাব মনকে ভরিয়ে তোলে তাই পুণ্য এবং স্বর্গতুল্য।

২। জগতে যখন মানুষের শরীর নিয়ে এসেছিস তখন দশের সেবা করে জীবন সার্থক করে নে। এতে তোরও মঙ্গল জগতেরও মঙ্গল।

৩। ধার্মিক হতে চাইলে প্রতিদিন রাতে শোবার সময় প্রতিদিনের কর্মের হিসেব নিকেশ করবি অর্থাৎ ভাল কর্ম কী কী করেছিস এবং মন্দ কর্ম কী কী করেছিস সে বিচার করবি। ভাল কার্য হল জমা আর খারাপ কার্য হল খরচ। সুতরাং তা চিন্তা করে মন্দ কর্ম আর যাতে করতে না হয় সেজন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হবি।

শ্রীশ্রী প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর

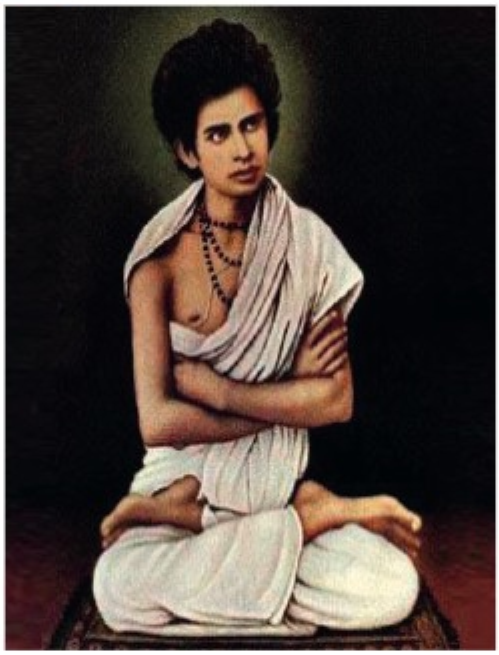

জন্ম : ১২৭৮ সালের ১৬ই বৈশাখ শুক্রবারের ব্রহ্ম মুহূর্তে ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার ডাহাপাড়া গ্রামে সীতা নবমীতে জন্মগ্রহণ করেন। মূলবাড়ি ফরিদপুর জেলার গোবিন্দপুর গ্রাম। বাবাঃ শ্রী দীননাথ ন্যায়রত্ন। মাঃ শ্রীমতী বামা দেবী। দেহত্যাগঃ ১৩২৮ সালের ১লা আশ্বিন। ফরিদপুরের 'শ্রীঅঙ্গন' ও ঢাকাস্থ 'প্রভু জগদ্বন্ধু মহাপ্রকাশ মঠ' তাঁর আদর্শ প্রচার করে চলেছে।

তাঁর ছোট বেলার নাম জগৎ। ছোটকালেই মাকে অতঃপর বাবাকে হারান। পিতা-মাতা হারা সন্তান বড় হয়ে উঠেন এক দিদির কাছে। দিদি দিগম্বরীর আশ্রয়ে বড় হতে থাকেন, তের বছর বয়সে পৈতা নেবার পর তার মধ্যে আসে পরিবর্তন। এ পরিবর্তনের ধারায় ক্রমে ক্রমে নিজেকে গড়ে তোলেন হরিনামের একনিষ্ঠ ভক্ত হিসেবে। আর হয়ে উঠেন অসংখ্য ভক্তবৃন্দের প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর। মানুষের মাঝে নিজে আচরিয়া ধর্ম পালনের উদ্দেশ্যে বলতেন, "আর কিছু পার আর নাই পার হরিনাম করিও।" তিনি বলতেন হরিনামের শক্তি অসীম। হরিনাম করলে শুধু ঠাকুরেরই নাম করা হয় না। এক সঙ্গে গুরু, গৌরাঙ্গ, গোপী ও রাধা-শ্যামেরই নাম নেয়া হয়। হরিনামের অপার মহিমা প্রচারে সমাজের ছোট বড় সকলের মধ্যে সাম্যবোধ আনয়নের প্রচেষ্টায় সুদীর্ঘকাল শ্রম আর শিক্ষা দিয়ে ১৩২৮ সালের ১লা আশ্বিন দেহটি মর্তে রেখে তিনি পরমব্রহ্ম হরির সাথে মিলিত হয়ে যান। হরিনাম প্রচারের জন্য তিনি ১৩২৩ সালের দিকে একটি কীর্তনের দল তৈরি করেছিলেন। সেই কীর্তনের দল "মহানাম সম্প্রদায়" প্রভুর আদর্শের বাণী সর্বদা প্রচার করে চলছে। তাঁর লীলা ক্ষেত্র ফরিদপুরের শ্রীঅঙ্গনে রাতদিন ২৪ ঘণ্টা চলছে হরির নাম। প্রভুর আদর্শ প্রচারে শ্রীঅঙ্গন এবং ঢাকায় প্রভু জগদ্বন্ধু মহাপ্রকাশ মঠ বিশেষ অবদান রেখে চলছে।

প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের কয়েকটি উপদেশঃ

১। প্রত্যেক জীবহৃদয়ে হরি আছেন। জীবকে হিংসা করলেই হরিকে হিংসা করা হয়।

২। তোরা আমায় স্মরণ করিস আর নাই করিস আমি নিত্য চিরকাল তোদিগকে স্মরণ করব। স্মরণ করে রক্ষা করব।

৩। সদা সর্বদা কৃষ্ণ নাম লিখবে, জপবে, ভাববে। কৃষ্ণই গতি, কৃষ্ণই পতি এই সার কথাই পরম ধর্ম। মানসে সদা যুগল সঙ্গ করে নিজেকে দাসী মনে করবে। কৃষ্ণকান্তি সদা নয়নে ও মানসে ভাসবে। কৃষ্ণ জীবনের ব্রত। তাকে ছাড়া অন্য কিছু জানবে না, ভাববে না।

৪। তোমরা সদাকাল সত্য কথা বলবে। যে সত্য পথে চলে কেউ তাহার কেশাগ্রও ছুঁইতে পারে না। বৃথা বাক্য ব্যয়ই দুর্ভাগ্য। কথোপকথনকে কলহ কহে। বাক্যে সংযত ও মৌনী হও। সদা হরি কথা কও।

শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দ

জন্ম: ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে মাদারীপুর জেলার বাজিতপুর গ্রামে।

বাবা: শ্রী বিষ্ণুচরণ ভুঁইয়া। মা: শ্রীমতী সারদা দেবী।

দেহত্যাগ: ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে ৪৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। 'প্রণব মঠ' এবং 'ভারত সেবাশ্রম সংঘ' তাঁর আদর্শ প্রচার করে চলেছে।

শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর

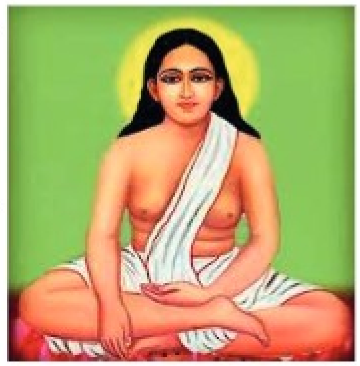

জন্ম: ১২১৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে মহাবারুণীর দিনে ব্রহ্ম মুহূর্তে গোপালগঞ্জের ওড়াকান্দি গ্রামে। বাবা: শ্রী যশোমন্ত বৈরাগী। মা: শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী। দেহত্যাগ: ১২৮৪ বঙ্গাব্দের ২৩শে ফাল্গুন। বর্তমানে 'বাংলাদেশ মতুয়া মিশন' ও 'বাংলাদেশ মতুয়া মহাসংঘ' তাঁর আদর্শের কথা প্রচার করে চলেছে।

শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের দ্বাদশ আজ্ঞা :

১. সদা সত্য কথা বলিবে।
২. পরোস্ত্রীকে মাতৃজ্ঞান করিবে।
৩. পিতা-মাতাকে ভক্তি করিবে।
৪. চরিত্র পবিত্র ব্যক্তির প্রতি জাতিভেদ করিবে না।
৫. কাহারো ধর্ম নিন্দা করিবে না।
৬. বাহ্য অঙ্গে সাধু সাজ ত্যাগ করিবে।
৭. ষড়রিপুর নিকট হতে সাবধান থাকিবে।
৮. হাতে কাজ মুখে নাম করিবে।
৯. প্রতি ঘরে হরি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবে।
১০. দৈনিক প্রার্থনা করিবে।
১১. ঈশ্বরে আত্মদান করিবে।
১২. জগৎ কে ভালবাসিবে।

শ্রীরাম ঠাকুর

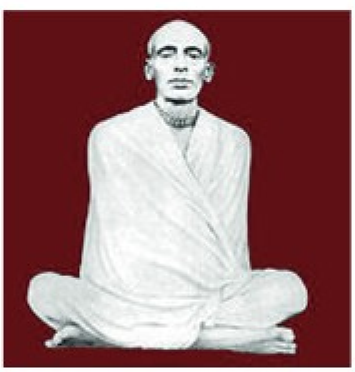

জন্ম: ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর জেলার ডিঙ্গামানিক গ্রামে।

বাবা: শ্রী মাধব চক্রবর্তী।

মা: শ্রীমতী কমলা দেবী।

দেহত্যাগ : ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে। নোয়াখালীর চৌমুহনী 'রামঠাকুর আশ্রম' ও চট্টগ্রামের 'কৈবল্যধাম' তাঁর আদর্শের বাণী প্রচার করে চলেছে।

মা আনন্দময়ী

জন্ম: ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার খেওড়া গ্রামে।
বাবা: শ্রী বিপিন বিহারী ভট্টাচার্য। মা: শ্রীমতী মোক্ষদাসুন্দরী।
দেহত্যাগ: ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে আগস্ট। রমনার আনন্দময়ী আশ্রম উল্লেখযোগ্য হলেও আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত। সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ি ও তাঁর নিজ গ্রামেও একটি আশ্রম আছে।

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

জন্ম : ১২৯৫ বঙ্গাব্দের ৩০শে ভাদ্র তালনবমীতে পাবনা জেলার হিমাইতপুরে। বাবা : শ্রী শিবচন্দ্র চক্রবর্তী। মা দেহত্যাগ: শ্রীমতী মনোমোহিনী দেবী। দেহত্যাগ : ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি। বিভিন্ন স্থানের সৎসঙ্গ আশ্রম তাঁর আদর্শের কথা প্রচার করে চলেছে। বাংলাদেশে হিমাইতপুর সৎসঙ্গ বিশেষ অবদান রাখছে এ ব্যাপারে।

তিনি মাত্র সতের বৎসর বয়সে রাম গোপাল ভট্টাচার্য মহাশয়ের কন্যা ষোড়শী বালার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। সংসার আর ধর্ম অর্থাৎ ধর্ম আর কর্মের এক অপার সমন্বয়ে তিনি এক অদ্ভূত সাধন প্রণালীর প্রবর্তন করেন।

মাথা মুড়িয়ে কৌপিন বা গেরুয়া পরবার দরকার নেই। ন্যাস, কুম্ভক বা আসন প্রাণায়ামের কঠোরতা নেই। আচার, নিয়ম-সংযমের অবলা বাহুল্য নেই। সংসার বা আত্মীয়-স্বজন ত্যাগের কোন কথা নেই। শুধু সদাচার, সদালাপ আর সৎ সঙ্গ। সংসারে থেকে নির্লিপ্ত ও অনাসক্তভাবে কাজ করে যেতে হবে। তিনি আরও বলতেন, আমিষ ভোজন বা উগ্র দ্রব্য খাওয়া চলবে না, মাদক দ্রব্য বর্জন করতে হবে। মনের বৃত্তি যাতে উচ্চ হয় এরূপ কর্ম করতে হবে। ঠাকুর ছিলেন একজন মহান মানব প্রেমিক। আত্মগত মোক্ষলাভের জন্য তিনি সাধনা করেননি কখনো। তাঁর সাধনার একমাত্র লক্ষ্য এক আদর্শ মানব সমাজ গড়ে তোলা। শিক্ষা ও দীক্ষায়, জ্ঞানে ও কর্মে, গুণে ও গরিমায় এই মানব সমাজ হবে সব দিক দিয়ে মহীয়ান। তিনি জানেন শুধু ভক্তির দ্বারা কোন মানব সমাজের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন হয় না। ভক্তির সঙ্গে চাই জ্ঞান, ধর্মের সঙ্গে চাই বিজ্ঞানের সমন্বয়। এ যুগের বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সঙ্গে চাই প্রাচীন ভারতের মুনি ঋষিদের শিক্ষা ও আদর্শের সুষম সংমিশ্রণ। তিনি বলেছেন, লোকের পেটে দুটো ভাতের যোগাড় করতে না পারলে, কৃষকের উন্নতি করতে না পারলে, হাজার চেষ্টায়ও দেশের উন্নতি বা ধর্মের উন্নতি হতে পারে না। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি আদর্শ তপোবন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

এইভাবে তিনি তাঁর কর্মময় জীবনে জীবের কল্যাণে রত থেকে ১৯৬৯ সালের ২৭ জানুয়ারি, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ ১২ মাঘ ব্রহ্মমুহূর্তে দেহত্যাগ করেন। তাঁর প্রচারিত আদর্শ হলো সত্যমন্ত্র এবং সৎসঙ্গ। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় সৎসঙ্গ আর ভারতের দেওঘর মন্দিরসহ অসংখ্য মন্দির তাঁর বাণী ও শিক্ষা প্রচার করে চলেছে।

* শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র এর কয়েকটি বাণীঃ

১। যে কর্মে মনে প্রসারণ নিয়ে আসে তাই সুকর্ম, আর যাতে মনে সংস্কার, গোঁড়ামি ইত্যাদি আনে, মূলকথা যাতে মন সংকীর্ণ হয় তাই কু-কর্ম।

২। নির্ভর কর আর সাহসের সাথে অদম্য উৎসাহে কাজ করে যাও, লক্ষ্য রেখো তোমা হতে তোমার নিজের ও অন্যের কোনরূপ অমঙ্গল না আসে। দেখবে সৌভাগ্যলক্ষ্মী তোমার ঘরে বাঁধা থাকবে।

৩। সত্যকে আশ্রয় কর, আর অসত্যের অনুগমন করো না, শান্তি তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে থাকবে না।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ

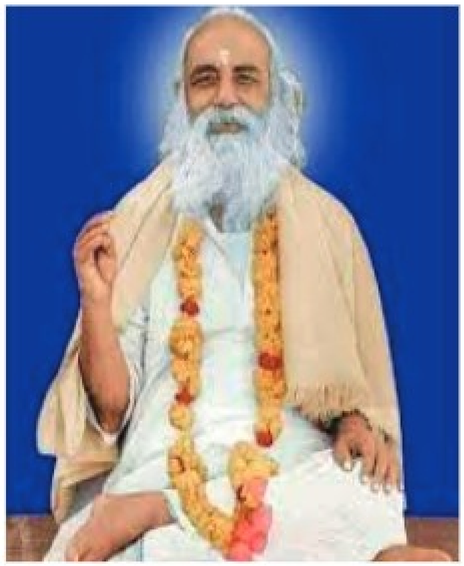

জন্ম : ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ নভেম্বর চাঁদপুর জেলার পুরাতন আদালত পাড়ায়। বাবা : শ্রী সতীশ চন্দ্র গাঙ্গুলী। মা : শ্রীমতী মমতা দেবী। বাল্যকালে নাম ছিল বঙ্কিম, ডাক নাম বল্টু। অখন্ড সমাজ গঠনে নিজের কর্মতৎপরতায় ওঁ-কারের পূজা প্রবর্তনে সমবেত উপাসনা ব্যবস্থা চালু করেন। ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিল কলকাতায় গুরুধামে দেহত্যাগ করেন।

বিভেদ বিচ্ছিন্নতায় নয় প্রকৃত শান্তি বা মুক্তি আসে অখন্ডে অর্থাৎ পূর্ণতায় এই আদর্শের আত্মপরিচায়ক হিসেবে যাঁর নাম চলে আসে অবলীলায় তিনিই হচ্ছেন অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ। পারিবারিক ধর্ম পরিমন্ডলে তিনি বড় হতে থাকেন এবং অতি অল্প বয়সেই নিজের মধ্যে ধর্মীয় ভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটান। কালের আবর্তে ধর্ম আর কর্ম এবং কর্মই ধর্ম এই মতাদর্শের মূর্ত প্রতীক হিসাবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে হয়ে উঠেন সকলের বাবামনি। সংসারে থেকেই ধর্ম পালন করার দৃঢ় প্রত্যয়ে তিনি বলেন, "প্রকৃত গৃহী ভোগ ব্যপারকেও সাধনা বর্জন করবে না। বৃথা ও অনাবশ্যক ইন্দ্রিয়চর্চা সযত্নে পরিহার করে যেকোন সম্ভোগকে সাধনার সাথে যুক্ত রাখবে। জীবের ধর্মে দেহ মিলিত হয়, দেহের সঙ্গে সংসার ধর্মে প্রয়োজনের দাবীতে। কিন্তু মানুষের মধ্যে শুধু জীব নেই। জীব ও শিব দুই-ই আছে। জীবের ধর্মে মানুষের দেহ যেমন-স্ত্রীর দেহের সঙ্গে মিলিত হতে চায়, তেমনি শিবের ধর্মে এক পরমার্থিক প্রেরণায় তার আত্মাও মিলিত হতে চায় অনাদি অনন্ত অনির্বচনীয় পরমাত্মার সঙ্গে। তাই প্রতিটি গৃহীকেও সাধনা করে যেতে হবে। যে সাধনা তাঁদের খণ্ড থেকে নিয়ে যাবে অখণ্ডতার উপলব্ধিতে।" ধর্ম সাধনার জন্য ত্যাগের প্রয়োজন নেই। সংসারাশ্রমে থেকেও ধর্মের মূল নীতিগুলোকে জীবনের প্রতি পদে সার্থক করে তোলা যায়।

তিনি ছিলেন একাধারে কর্মযোগী সন্ন্যাসী, সিদ্ধ জ্ঞানযোগী পরমহংসদেব। আবার তিনি যেখানে ব্রহ্মের উপাসক, অমৃত মন্ত্রের সাধক সেখানে তিনি পরম ভক্ত। জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তি যোগের সমন্বয়ে গড়া তাঁর

দিব্য জীবন। ওঙ্কার মন্ত্রের একনিষ্ঠ সাধক ও অখণ্ড বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা কর্মযোগী স্বরূপানন্দের সাধনার শেষ নেই। জগতের কল্যাণের জন্য কর্মে তাঁর কিছু মাত্র বিরতি নেই। নিখিল বিশ্বের প্রতিটি নর-নারীর দৈহিক ও আত্মিক উন্নতির জন্য তাঁর চিন্তাভাবনার অন্ত ছিল না। তিনি ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিল কলিকাতার কাকুরগাছিতে অবস্থিত সংঘ কার্যালয় "গুরুধামে" তাঁহার ইহজাগতিক লীলা ত্যাগ করেন। "অযাচক আশ্রম" এবং "অখণ্ডমণ্ডলী" তার আদর্শের বাণী প্রচার করে চলেছে। এ ক্ষেত্রে "অযাচক আশ্রম" রহিমপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা এবং চট্টগ্রাম "অখণ্ডমণ্ডলী" ১৮নং রহমতগঞ্জ উপাসনা মন্দিরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দের কয়েকটি উপদেশ :

১। মানুষের সাথে মানুষের প্রেম সম্মন্ধকে বিস্তারিত করার নামই ধর্ম। যাহা মানুষকে মানুষের পর করে তা অর্ধম। নিখিল বিশ্বকে আপন করার সাধনার নামই হিন্দু ধর্ম।

২। স্মরণ রেখো জীবন তোমাকে দিয়েছেন ভগবান, তুমি সেই জীবন ভগবানকে ফিরিয়ে দিবে, কলুষ-পঙ্কিল এবং ঘৃণিত করে না। জীবনকে পবিত্র শুভ্র রেখে চন্দন-চর্চ্চিত ফুলটির মতো ভগবানের নিকট সমর্পণ করতে হবে।

৩। নিবেদন না করে অন্ন গ্রহণ করা উচিত নয়। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ নিজেকে ব্রহ্মজ্ঞান করে এবং অনুকেও ব্রহ্মজ্ঞান করে অন্ন গ্রহণ দ্বারা ব্রহ্মেরই সেবা করে থাকেন। যাঁরা ভক্ত তাঁরা ভগবানের মানসিক সেবা করিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করবেন।

রানি রাসমণি

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে রানি রাসমণি কলকাতার উত্তরে গঙ্গার পূর্বতীরে হালিশহরের নিকট কোনা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হরেকৃষ্ণ দাস। মাতা রামপ্রিয়া দাসী। হরেকৃষ্ণ দাসের পেশা ছিল গৃহ নির্মাণ ও

কৃষিকাজ। জন্মের পর মা রামপ্রিয়া মেয়ের নাম রাখেন রানী। পরে তার নাম হয় রাসমণি। ১৮০৪ খ্রিষ্টাব্দে জমিদার রাজচন্দ্র দাসের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাদের চার কন্যা-পদ্মামনি, কুমারি, করুণা এবং জগদম্বা। রাজচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত কর্ম কুশল। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন বুদ্ধিমতি স্ত্রী রানী রাসমণি। কিন্তু ব্যবহারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক। এর ফলে তার সাফল্য আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। পিতার মৃত্যুর পর রাজচন্দ্র বিশাল সম্পদের অধিকারি হন। রাজচন্দ্র ছিলেন উদার প্রকৃতির মানুষ। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল স্ত্রী রাসমণির অনুপ্রেরণা।

ফলে এই জমিদার পরিবার জনকল্যাণের জন্য অনেক কাজ করে গেছেন। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে বন্যায় বাংলার অনেক পরিবার অসহায় হয়ে পড়ে। রানি রাসমণি তাদের সহয়তার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করেন। ঐ বছরই রানি রাসমণির পিতা পরলোক গমন করেন। রাসমণি কন্যার কর্তব্য অনুসারে পিতার পারলৌকিক ক্রিয়া করার জন্য গঙ্গার ঘাটে যান। কিন্তু যাতায়াতের রাস্তা এবং গঙ্গার অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। তাই জনগনের সুবিধার কথা চিন্তা করে রানি স্বামীকে অনুরোধ করেন সংস্কারের জন্য। রাজচন্দ্র বহু টাকা খরচ করে বাবু ঘাট ও বাবু রোড নির্মান করেন। রাজচন্দ্র ও রাসমণির দাম্পত্য জীবন

খুব বেশি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মাত্র ৪৯ বছর বয়সে রাজচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করেন। এর ফলে জমিদারির সমস্ত দায়িত্ব পড়ে রানি রাসমণির ওপর। কিন্তু জমিদারির পাশাপাশি তিনি জনকল্যাণ ও ধর্মচর্চা সমানভাবে করে গেছেন। ১৮৩৮ সালে রানি রাসমণি অনেক টাকা খরচ করে একটি রথ তৈরি করেন। তাতে জগন্নাথ দেবকে বসিয়ে রথযাত্রার দিন পরিবারের লোকজনকে নিয়ে কোলকাতার রাস্তায় শোভাযাত্রা বের করেন। একবার তিনি পূণ্যভূমি জগন্নাথ ক্ষেত্রে যান। সেখানকার রাস্তাঘাট ছিলো জরাজীর্ণ। তীর্থযাত্রীদের খুব কষ্ট হতো চলাফেরা করতে। রাসমণি তাদের সুবিধার কথা চিন্তা করে সমস্ত রাস্তা সংস্কার করে দেন। শুধু তাই নয়, ষাট হাজার টাকা ব্যয় করে তিনি জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা এই তিন বিগ্রহের জন্য হীরক খচিত তিনটি মুকুটও তৈরি করে দেন। রানি তার প্রজাদের সন্তানের ন্যায় পালন করতেন।

একবার এক নীল কর সাহেব মকিমপুর পরগণায় প্রজাদের ওপর উৎপীড়ন শুরু করেন। এ কথা রানি শুনতে পান এবং তার হস্তক্ষেপে তা বন্ধ হয়। তিনি প্রজাদের উন্নতিকল্পে এক লক্ষ টাকা খরচ করে টোনার খাল খনন করেন। এর ফলে মধুমতী নদীর সঙ্গে নব গঙ্গার সংযোগ সাধিত হয়। এছাড়া সোনাই বেলিয়াঘাটা ও ভবানীপুরে বাজার স্থাপন এবং কালীঘাট নির্মাণ তার অনন্য কীর্তি। রানি রাসমণির জীবনী থেকে আমরা এই নীতিশিক্ষা লাভ করতে পারি যে, মানুষের জন্মের চেয়ে তার কর্মই বড়। জন্ম যেখানেই হোক না কেন কর্মের দ্বারা মানুষ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতে পারে। এটাই প্রত্যেক এর জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। সম্পদকে মানুষের সেবায় লাগাতে হবে। শুধু নিজের সুখ নয় অপরের সুখের জন্যও সম্পদ ও ক্ষমতার ব্যবহার করতে হবে। এভাবে ধর্মচর্চা ও জনসেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারলে জীবন সার্থক হয়।

শ্রীশঙ্করাচার্য

দক্ষিণাত্যের কেরল রাজ্যে কালাড়ি নামে এক গ্রাম। এই গ্রামে ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দের বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে শ্রীশঙ্করাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শিবগুরু এবং মাতার নাম বিশিষ্টা দেবী। শিবগুরু ছিলেন একজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং শিবভক্ত। শঙ্করের ছিল অসাধারণ মেধা ও স্মৃতিশক্তি। তা দেখে পিতা শিবগুরু অত্যন্ত বিস্মিত হন। তিনি তিন বছর বয়স থেকেই পুত্রকে পড়াতে শুরু করেন। তাঁর একান্ত বাসনা, পুত্রকে সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত করে তুলবেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। তারপর পাঁচ বছর বয়সে বিশিষ্টা দেবী ছেলের উপনয়ন দেন। উপনয়নের পর শাস্ত্রশিক্ষার জন্য তাঁকে গুরুগৃহে পাঠানো হয়। সেখানে মাত্র দুই বছরের মধ্যে শঙ্কর বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। সাত বছর বয়সে বাড়ি ফিরে আসেন। বাড়ি ফিরে তিনি একটি টোল খুলে ছাত্র পড়াতে শুরু করেন। স্থানীয় পণ্ডিতরা প্রথমে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে লাগলেন। সাত বছরের বালক কী পড়াবে? কিন্তু ক্রমে শঙ্করের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে সবাই তাঁর নিকট মাথা নত করেন। শঙ্করের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। একসময় কেরলের রাজা চন্দ্রশেখরের কানেও যায়

একথা। তিনি মন্ত্রীকে পাঠান শঙ্করকে রাজসভায় নিয়ে যেতে। কিন্তু শঙ্কর বিনয়ের সঙ্গে বলেন, তিনি বিদ্যা নিয়ে ব্যবসা করতে চান না। লোকের মঙ্গলের জন্য তিনি বিদ্যা বিতরণ করবেন। বালক শঙ্করের এই তেজোদৃপ্ত কথা শুনে রাজা বিস্মিত হন। তিনি নিজে চলে আসেন শঙ্করের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর সঙ্গে কথা বলে রাজা তাঁর পাণ্ডিত্যের গভীরতা বুঝতে পারেন। তাই রাজা হয়েও এই অসাধারণ বালক পণ্ডিতকে প্রণাম করে তিনি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দান করেন। কিন্তু শঙ্কর তার একটিও সম্পর্শ করেননি। সব দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছেন।

তিনি মাকে খুব ভালোবাসতেন। টোলের ছাত্রদের পড়ানোর অবসরে যে সময়টুকু পেতেন, তখন তিনি কেবল মায়ের সেবা করতেন। কিন্তু মৃত্যুর কথা শুনে তাঁর ভেতরে এক বিরাট পরিবর্তন আসে। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তিনি নতুন করে ভাবতে লাগলেন। তিনি ভাবলেন, মোক্ষলাভই মানুষের চরম লক্ষ্য। তাই ব্রহ্ম সাধনায় তিনি বাকি জীবন কাটিয়ে দেবেন।

এরপর ধর্মগুরু হিসেবে শুরু হয় শঙ্করের নতুন জীবন। তিনি তখন আচার্য নামে খ্যাত। শঙ্কর আচার্য। তাঁর মতের মূল কথা 'অদ্বৈতবাদ'। তিনি বলেন, 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। জীব ও ব্রহ্মে কোনো পার্থক্য নেই'।

শঙ্কর তাঁর মতবাদ প্রচারের জন্য সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়ান। তিনি ভারতবর্ষের চার প্রান্তে চারটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বারকায় সারদা মঠ, পুরীতে গোবর্ধন মঠ, জ্যোতির্ধামে (বদরিকাশ্রমে) যোশী মঠ এবং রামেশ্বরে শৃঙ্গেরী মঠ। এই মঠ পরিচালনার জন্য তাঁর চারজন শিষ্যকে দায়িত্ব অর্পণ করেন। শঙ্করাচার্য তাঁর অদ্বৈতমত প্রচার করে হিন্দুধর্মের অতীত এতিহ্য ফিরিয়ে আনেন। 'জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে পার্থক্য নেই' এ কথা বলে তিনি মানুষের প্রতি মানুষের, এমনকি জীবের প্রতিও মানুষের ভালোবাসাকে জাগিয়ে তোলেন। এর ফলে জীব হিংসা কমে যায়। এটা শঙ্করাচার্যের একটা বড় অবদান। শুধু তা-ই নয়, তিনি যে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ও বেদান্তভাষ্য রচনা করেছেন তা হিন্দু ধর্ম ও দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে এক অসাধারণ অবদান। এছাড়া তিনি সাধারণ মানুষের জন্য মোহমদগর, আনন্দলহরী, শিবস্তব, গোবিন্দষ্টক প্রভৃতি গ্রন্থও রচনা করে গেছেন। মাত্র ৩২ বছর বয়সে এত অসাধারণ কাজ করে আচার্য শঙ্কর উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথে ইহলীলা সংবরণ করেন। তার আগে অবশ্য তিনি মায়ের অন্তিম শয্যায় উপস্থিত ছিলেন, যেহেতু তিনি মাকে কথা দিয়েছিলেন।

পাঠ-১০

মন্দির ও তীর্থস্থান পরিচিতি

মন্দির কাকে বলে?

আমরা সনাতন ধর্মাবলম্বীরা অর্থাৎ হিন্দুরা বিভিন্ন দেব-দেবীকে পূজা করি। পূজা হচ্ছে নির্দিষ্ট কোন সময় বা দিনে নির্দিষ্ট দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে ফুল, জল এবং নৈবেদ্য উৎসর্গ করে ঐ দেব-দেবীকে শ্রদ্ধা জানানো।

এই যে দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে ফুল-জল দিয়ে তাঁকে রাখার জন্য যে ঘর নির্মিত হয়, তাকেই বলা হয় মন্দির। আমাদের অধিকাংশ বাড়িতেই গৃহদেবতা কিংবা অন্য কোনো দেবতার মন্দির আছে। আসল কথা মন যেখানে স্থির হয়, তার নামই মন্দির।

মন্দিরের নামকরণ হয় কীভাবে?

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজার্চনা হয়। সাধারণত যে দেব-দেবীর পূজা যে মন্দিরে হয় সেই মন্দিরের নাম ঐ দেব-দেবীর নাম অনুসারেই হয়। যেমন- শ্রীশ্রী দুর্গা মন্দির, শ্রীশ্রী কালী মন্দির, শ্রীশ্রী লক্ষ্মী মন্দির, শ্রীশ্রী সরস্বতী মন্দির, শ্রীশ্রী হরি মন্দির, শ্রীশ্রী বিষ্ণু মন্দির ইত্যাদি।

তীর্থস্থান কী?

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে একটি বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, কোনো মহৎ কর্ম যে স্থানে হয় অথবা কোনো মহৎ ব্যক্তি তাঁর কর্মকাণ্ড যে স্থানে পরিচালনা করেন সেই স্থানটিও পবিত্র। সেই স্থানে ভ্রমণ করলে বা গেলে মনের কালিমা দূর হয়। মন পবিত্র হয়। আর এর মাধ্যমে মনে শান্তি আসে। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই নির্দিষ্ট কোনো স্থান পবিত্র স্থান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করলে তাকে তীর্থস্থান বলে। তীর্থস্থান ভ্রমণ সকলের জন্য ভালো।

নিম্নে কয়েকটি তীর্থস্থানের নাম দেওয়া হলো:

গয়া, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, পুরী, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, গৌরীকুণ্ড, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, দ্বারকা, অযোধ্যা, তারাপীঠ, গঙ্গাসাগর, প্রয়াগ, কন্যাকুমারী ইত্যাদি। এ তীর্থস্থানগুলো সব ভারতে অবস্থিত।

আমাদের দেশে তীর্থস্থানগুলোর মধ্যে চন্দ্রনাথ (সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম), আদিনাথ (মহেশখালী, কক্সবাজার), পুণ্ডরীকধাম (চট্টগ্রাম), তারাপাশা (মৌলভীবাজার), লাঙ্গলবন্ধ, (বারদী নারায়ণগঞ্জ), ঢাকা দক্ষিণ (সিলেট), হিমাইতপুর (পাবনা), শ্রীঅঙ্গন (ফরিদপুর), তারাবাড়ি (বরিশাল), খেতুরীধাম (রাজশাহী), হরিদাস ঠাকুরের পাটবাড়ি (বেনাপোল), রূপসনাতন ধাম (যশোর), ওড়াকান্দি (গোপালগঞ্জ), কদমবাড়ী (মাদারীপুর) ইত্যাদি।

গয়া

ভারতের বিহার প্রদেশে ফল্গু নদীর তীরে গয়া অবস্থিত। দেবতাদের যজ্ঞের জন্য গয়াসুর এখানে তার দেহ দান করেছিলেন। গয়া হিন্দুদের একটি পবিত্র তীর্থস্থান, এখানে শ্রীবিষ্ণুর মন্দির আছে। বিষ্ণুপদে পিণ্ড দিলে মৃত ব্যক্তির মুক্তি হয়। তার আর জন্ম হয় না। মৃত পিতা-মাতা ও পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে গয়াতে পিণ্ড দেওয়া

হয়। গয়াতে পিণ্ড দান করা পুত্রের একটি বড়ো কর্তব্য।

গয়া হিন্দুর পরম পবিত্র এবং প্রধান তীর্থস্থান। প্রাচীনকালে দ্বাপরের শেষ পর্যন্ত একে মগধ বলত। সে সময় রাজা জরাসন্ধ এখানে রাজত্ব করতেন। এস্থানে পিতৃপুরুষদের নামে পিণ্ডদান করা হয়। শৈলমালার শোভা গয়ার প্রাকৃতিক দৃশ্য। রামশিলা, ব্রহ্মযোনি ইত্যাদি পাহাড়ের দ্বারা বেষ্টিত। সমস্ত পর্বতের শিখরেই দেব-দেবীর মন্দির আছে। রামশিলা ৩০২ ফুট উচ্চ। এর উপরে উঠবার সিঁড়ি আছে। বৌদ্ধ সাহিত্যে ব্রহ্মযোনি পর্বতের বিষয়ে লেখা আছে যে, গৌতম বুদ্ধের স্মৃতি অক্ষুন্ন ও চিরস্থায়ী রাখার জন্য সম্রাট অশোক এর শিখরের ওপর একটি স্তুপ নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ আর তার চিহ্নমাত্র নেই। ফল্গু নদী গয়াতীর্থের চরণ ধৌত করে দক্ষিণ হতে উত্তরে প্রবাহিত হয়েছে। এটি একটি পাহাড়ি নদী বিশেষ। এতে জলের পরিবর্তে মরুভূমি সদৃশ্য বালুকারেণু দেখতে পাওয়া যায়। তটে বিস্তর দেব-দেবীর মন্দির আছে, তার মধ্যে বিষ্ণুপাদ মন্দিরই সর্বশ্রেষ্ঠ। এর নির্মাণকারিণী বিশ্ববিখ্যাত পুণ্যময়ী মহারানি অহল্যাবাঈ।

গয়ার মাহাত্ম্য

ধন্য ধন্য গদাধর ত্রিলোক বিহারী ।
গয়াসুর প্রতি করিলেন কৃপাচারী ।।
ধন্য গয়াসুর না, গয়াক্ষেত্র ধাম,
ধন্য করিল কলির জীবেরে।
যে জন এ মান করে, ভক্তিপূর্ণ অশ্রুবারে,
তুষিবেক পিতৃপুরুষগণের।
এ ধন যে নাহি জানে, বৃথা জন্ম এ জীবনে,
অবশেষে করিব কলি গ্রাসে।
কহ ভাই হরি হরি, বদন ভরিয়া হরি,
গয়াসুর রেখেছে চরণ শিরে করি ।।

যখন গয়াসুর দৈত্য ব্রহ্মার দ্বারা যজ্ঞ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে তপস্যা আরম্ভ করলো তখন ব্রহ্মা তার মাথার ওপর একখানা পাথর রেখে মুক্ত করলেন, সে স্থানে গদাধর নামে শ্রীভগবান প্রকট হয়ে সর্বদা বিরাজ করতে লাগলেন। সে স্থানে দেবতাদের সাথে যজ্ঞ করে ব্রাহ্মণগণকে নানা প্রকার বস্তু দান করলেন। সে সময় হতে উক্ত ক্ষেত্র অত্যন্ত পবিত্র বলে গণ্য হচ্ছে। পিতৃলোক সর্বদা মনে করেন যে, অনেক পুত্রের মধ্যে যদি একটি পুত্র গয়াক্ষেত্রে গিয়ে নীল বৃষোৎসর্গ, পিণ্ডদান, অন্নদান কিংবা যাহা কিছু সে দান করবে তা হতেই পিতৃপুরুষগণ মুক্ত হবেন। যদি কোন লোক কাহারও নাম গোত্র লইয়া গয়াতে পিণ্ডদান করেন সে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদান করলে, কুরুক্ষেত্রে বাসের ফলপ্রাপ্তি হয়। যদি কেহ গয়াক্ষেত্রে যেয়ে শ্রাদ্ধ করে তা হলে তাকে অন্য কোন স্থানে বাস করবার প্রয়োজন হয় না। মলমাসে জন্মক্ষেত্রে বৃহস্পতিতেও গয়াশ্রাদ্ধ হয়ে থাকে। যদি ভ্রমক্রমে গয়াক্ষেত্রে মৃত্যু হইয়া যায় সে মুক্ত হইয়া যাবে এতে সন্দেহ নাই। গয়ায় গিয়ে ব্রাহ্মণভোজন অবশ্যই করাবেন, ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হলে পিতৃলোকও সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন। গয়াক্ষেত্রে মস্তক মুণ্ডন করালে একশত এক কুল পর্যন্ত পিতৃলোক মুক্ত হয়ে যায়। গয়াক্ষেত্রে গদাধর ভগবানকে স্মরণপূর্বক পিতৃলোক যেই স্থানে থাকুক না কেন তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হবেন। গয়াতে পিণ্ডদান করার সময় কামক্রোধাদি অবশ্য ত্যাগ করবেন এবং জীবমাত্রেই সম্পূর্ণ মঙ্গল কামনা করিবেন। যে মানুষ তীর্থে গিয়ে নিজের মন অন্য দিকে ফিরাবে তার তীর্থযাত্রার ফল কখনও হয় না। গয়াক্ষেত্রের স্থানে স্থানে তীর্থ আছে, এ কারণে গয়াক্ষেত্র সমস্ত তীর্থ হতে শ্রেষ্ঠ তীর্থ বলে গণ্য হয়ে থাকে। যদি কেহ মীন, মেষ, কন্যা, ধনু ও মকরের চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সময় গয়ায় পিণ্ডদান করেন, তাহার ন্যায় ফল তিনলোকেও দুর্লভ।

কাশী

পুরাকালে একদা ভৃগুমুনি বেরা নদীর তীরে সানন্দচিত্তে বসে ছিলেন। এমন সময় লোমশাদি ঋষিগণ তথায় সমাগত হয়ে বিনয়াবনত মস্তকে তাঁকে বললেন, 'হে ভগবান, ধর্মের সমস্ত মর্ম আপনি অবগত আছেন। অতএব, কী উপায়ে মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ নির্বাণ বা মুক্তি অর্জন করতে পারে, তাহা কৃপাপূর্বক আমাদিগকে বলুন।' তখন সে তত্ত্বদর্শী মুনিবর বললেন, 'আপনাদের এ উৎকৃষ্ট প্রশ্নে আমি পরম প্রীতিলাভ করলাম। আপনারা যে প্রশ্ন করেছেন তার যথার্থ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে স্বয়ং ব্রহ্মারও অনেক সময় লাগে। যাহা হউক, তাঁর নিকট আমি যেরূপ শ্রবণ করেছি, তা আপনারা শুনুন-

কল্পনাতে যখন যাবতীয় পদার্থের লয় হয়ে বহুকাল গত হল, তখন ভগবান শ্রীপতি পুনরায় সৃষ্টি করবার মানসে আকাশের সৃষ্টি করলেন, তৎপরে বায়ু, তেজ এবং জল ও জল হতে ক্ষিতির সৃষ্টি করলেন। পরে তিনি লীলাদেহ ধারণ করলেন এবং তাঁর নাভিপদ্ম হতে ব্রহ্মা সৃষ্টি হলেন। ব্রহ্মা হতে ক্রমশ সর্বজীবের উৎপত্তি হল। ব্রহ্মা ও নারায়ণের মধ্যে সৃষ্টিকর্তা কে এ বিষয়ে তুমুল তর্ক-বিতর্ক হল এবং প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ হল। এভাবে বহু বসে অতীত হবার পর তাঁদের সম্মুখে এক বিশাল জ্যোতির্লিঙ্গ আবির্ভূত হল এবং উভয়ে বিস্মিত এবং হতবুদ্ধি হলেন। ক্রমে সে লিঙ্গ এক পুরুষের আকার ধারণ করল। উভয়ে এ মূর্তিকে পরমপুরুষ জ্ঞানে স্তব করতে লাগলেন। তখন সে পরমপুরুষ বললেন, তোমরা একত্রে আমার লিঙ্গমূর্তি দর্শন করলে। ইহা

সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। এর নাম বিশ্বেশ্বর এবং ইহার অপবর্ণ নিঃশ্রেয়স মুক্তির একমাত্র সাধন। এ জ্যোতির্লিঙ্গ বা বিশ্বেশ্বর যে স্থানে আবির্ভূত n‡jv, সে ক্ষেত্রে মানবগণ প্রবেশমাত্রই সমস্ত পাপ হতে মুক্ত হবে। এ ক্ষেত্র আমি কখনও ত্যাগ করে যাব না, এজন্য ইহাকে অভিযুক্ত বলা হবে। এখানে যারা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে আমি তাদের কর্ণে তারক ব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করব।

তারপর মুনি ভৃগু পুনরায় বললেন, হে মুনিগণ নারায়ণ এবং ব্রহ্মার জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে যে পরমপুরুষ দর্শন করেছিলেন, তা-ই কাশীধামে নির্বাণদাতা বিশ্বেশ্বর এবং সে জ্যোতিই কাশীক্ষেত্র।

সত্যযুগে ভূরিদ্যুম্ন নামক এক রাজা ছিলেন। তাঁর বহু সংখ্যক স্ত্রীর মধ্যে বিভাবরীর প্রতি তিনি বিশেষ আসক্ত ছিলেন। রাজকার্যে অবহেলার দরুন শত্রুরা তাঁর রাজ্য আক্রমণ করে দখল করে নিল। তিনি বিভাবরীকে নিয়ে বনে গেলেন। ক্ষুধা-পিপাসায় একান্ত অধীর হয়ে তিনি একদিন বিভাবরীকেই বধ করে তাহার মাংস ভক্ষণ করতে উদ্যত হলেন। সে সময়ে কয়েকটি সিংহ হঠাৎ সেস্থানে এসে পড়ায় রাজা পলায়ন করলেন এবং পথিমধ্যে কয়েকজন ব্রহ্মচারী ভিক্ষা শেষ করে কুটিরাভিমুখে যাচ্ছে দেখলেন। ভিক্ষান্নের লোভে রাজা তাদেরকেও বধ করলেন। হঠাৎ তাদের যজ্ঞোপবীত দর্শনে রাজার জ্ঞানোদয় হলো। তিনি বুঝলেন যে তিনি ব্রাহ্মণ ও স্ত্রী হত্যা করে ঘোর পাপ অর্জন করেছেন। তখন তিনি শালঙ্কায়ন মুনির কাছে গমন করেন এবং মুনি তাঁকে উপদেশ দেন যে তিনি পাপ হতে মুক্তিলাভার্থে কাশীপুরীতে গমন করুন। তথায় গমন করলে অগ্নিতে তুলার ন্যায় তাঁহার সমস্ত পাপ ধ্বংস হবে। তিনি কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করে কাশীতে প্রবেশমাত্রই ঐ বস্ত্র শুভ্র হয়ে যাবে। মুনির উপদেশে রাজা কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করে কাশীক্ষেত্রে প্রবেশ করা মাত্র তাঁর বস্ত্র শুভ্র হয়ে গেল। রাজাও পরম বিস্মিত হয়ে কাশীর মহিমা চিন্তা করতে করতে ভগবানের পূজা করতে লাগলেন।

মথুরা ও বৃন্দাবন

মথুরা একটি বিখ্যাত তীর্থস্থান। এখানে শ্রীকৃষ্ণের মন্দির আছে। মথুরা ভারতের উত্তর প্রদেশে অবস্থিত। এ মথুরা নগরীতেই কংসের কারাগারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। মথুরার কাছেই বৃন্দাবন। বৃন্দাবনেই কাটে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকাল বা ছেলেবেলা। বৃন্দাবন আর মথুরা এ দু'জায়গাতেই শ্রীকৃষ্ণের বহু অলৌকিক লীলা সংগঠিত হয়। অত্যাচারী রাজা কংসকে তিনি বধ করেন, কংসের মৃত্যুতেই মথুরায় শান্তি ফিরে আসে। মথুরা ও বৃন্দাবনে বহু কৃষ্ণ লীলার চিহ্ন আছে। মথুরা ও বৃন্দাবন বৈষ্ণবদের অতি প্রিয় স্থান।

শ্রীশ্রী চন্দ্রনাথ ধাম

শ্রীশ্রী চন্দ্রনাথ ধাম চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে অবস্থিত। সত্যযুগে দক্ষরাজ একটি যজ্ঞের আয়োজন করেন। সেই যজ্ঞে তিনি জামাতা শিবকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। শিবের পত্নী সতী সেই যজ্ঞে যান। সতীকে দেখে সতীর সামনে শিবকে অবজ্ঞা করায় সতী অপমান বোধ করেন। অপমানের জ্বালায় রাগে, দুঃখ ও ক্ষোভে তিনি দেহ ত্যাগ করেন। সতীর দেহ ত্যাগের পর দেবাদিদেব মহাদেব উন্মত্ত হয়ে পড়েন। শিব স্ত্রীর দেহ কাঁধে তুলে তাণ্ডবনৃত্য শুরু করেন। শিবের সেই প্রলয় নৃত্যে ভীত হয়ে পড়েন সকল দেবতা। সৃষ্টি বুঝি রসাতলে যায়। এ তাণ্ডব থেকে সৃষ্টিকে রক্ষার্থে বিষ্ণু তখন সুচক্র দ্বারা সতীর দেহকে খণ্ডবিখণ্ড করে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দেন। কথিত আছে সতীর মৃতদেহ একান্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে যা একান্ন পীঠ নামে খ্যাতি লাভ করে। এই একান্ন পীঠের মধ্যে সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে পতিত হয় সতীর ডান হাত। সনাতন ধর্মাবলম্বীগণ তাই এ স্থানকে পীঠস্থান বলে মানেন এবং এখন এটি একটি তীর্থস্থান। প্রতিবছর শিব চতুর্দশীতে দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম হয় এ তীর্থভূমিতে।

ছবিতে ১৩০০ ফুট উঁচু চন্দ্রনাথ পাহাড়ের চুড়ায় মন্দিরটি দেখা যাচ্ছে। এ তীর্থস্থানটির পাদদেশে রয়েছে বেশ কটি মন্দির। সীতা মন্দির, স্বয়ম্ভুনাথ, রামকুণ্ড, লক্ষণকুণ্ডসহ আরও কয়েকটি মন্দির।

দেবীপীঠের সংখ্যা সম্বন্ধে পুরাণসমূহে এবং তন্ত্রসমূহে নানা সংখ্যা পাওয়া যায়। মৎস্য পুরাণ, স্কন্দপুরাণ, দেবী ভাগবত এবং পদ্মপুরাণে ১০৮টি দেবীপীঠের তালিকা আছে। কিন্তু এর মধ্যে দেবীর অঙ্গচ্ছেদজনিত মহাপীঠের সংখ্যা নাই। কিন্তু কালিকা পুরাণে মহাপীঠের তালিকা পাওয়া যায়। তন্ত্রচুড়ামণি অন্তর্গত পীঠ নির্ণয় বা মহাপীঠ নিরূপণ নামক প্রকরণে একান্ন পীঠের যে বর্ণনা আছে তা-ই পাঠকের জ্ঞাতার্থে এখানে উদ্ধৃত করা হলো।

১। হিঙ্গুলায় কোট্টরী দেবী।	২। করবীতে মহিষমর্দিনী।
৩। সুগন্ধায় সুনন্দা দেবী (বাংলাদেশ)।	৪। কাশ্মীরে মহামায়া।
৫। জ্বালামুখীতে অম্বিকা।	৬। জালন্ধরে ত্রিপুরা মালিনী।
৭। বৈদ্যনাথে জয় দুর্গা।	৮। নেপালে মহামায়া।
৯। মানসে দাক্ষায়ণী।	১০। উৎকলে বিমলা।
১১। গণ্ডকীতে গণ্ডকী চণ্ডী।	১২। বাহুলাতে বাহুলা দেবী।
১৩। উজ্জয়িনীতে মঙ্গলচণ্ডী।	১৪। চট্টলে ভবানী (বাংলাদেশ)।
১৫। ত্রিপুরায় ত্রিপুরা সুন্দরী।	১৬। ত্রিশ্রোতায় ভ্রামরী (বাংলাদেশ)।
১৭। কামগিরিতে (কামরূপে) কামাক্ষ্যা (যোনিপীঠ)।	১৮। ক্ষীর গ্রামে যুগাদ্যা।
১৯। কালীঘাটে কালিকা।	২০। প্রয়াগে ললিতা।
২১। জয়ন্তী রাজ্যে দেবী জয়ন্তী (বাম জঙ্ঘাপীঠ) বাংলাদেশ।	২২। কিরীটদেশে বিমলা (কিরীটেশ্বরী)।
২৩। রাবণসীতে বিশালাক্ষী।	২৪। কন্যাশ্রমে সর্বাণী।
২৫। কুরুক্ষেত্রে সাবিত্রী।	২৬। মণিবন্ধে গায়ত্রী।
২৭। শ্রীশৈলে (শ্রীহট্টে) মহালক্ষ্মী (বাংলাদেশ)।	২৮। কাঞ্চীদেশে দেবগর্ভা।
২৯। কালমাধবে কালী।	৩০। নর্মদায় শোণাক্ষী।
৩১। রামগিরিতে শিবানী।	৩২। বৃন্দাবনে উমা।
৩৩। শুচি দেশে নারায়ণী।	৩৪। পঞ্চসাগরে বারাহী।
৩৫। করোতোয়া তটে অপর্ণা (বাংলাদেশ)।	৩৬। শ্রীপর্বতে শ্রীসুন্দরী।
৩৭। বিভাসে কপালিনী।	৩৮। প্রভাসে চন্দ্রভাগা।
৩৯। অবন্তীতে মহাদেবী।	৪০। জলস্থানে ভ্রামরী।
৪১। গোদাবরী তীরে বিশ্বমাতৃকা।	৪২। রত্নাবলীতে কুমারী।
৪৩। মিথিলায় উমা দেবী।	৪৪। নলহাটিতে কালিকা।
৪৫। কালীঘাটে জয় দুর্গা।	৪৬। বক্রেশ্বরে মহিষ মর্দিনী।
৪৭। যশোরে যশোরেশ্বরী (বাংলাদেশ)।	৪৮। অট্টহাসে ফল্লরা।
৪৯। নন্দিপুরে নন্দিনী।	৫০। লঙ্কায় ইন্দ্রাণী।
৫১। বিরাটদেশে অম্বিকা।	

একান্ন পীঠের মধ্যে বাংলাদেশে অবস্থিত পীঠসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরা হলোঃ

সুগন্ধায় সুনন্দা দেবী (বাংলাদেশ)।

বাংলাদেশের বরিশাল শহরের প্রায় ১২ মাইল উত্তরে শিকারপুরে সুগন্ধা নদীর তীরে এই মহাপীঠ অবস্থিত। এখানে দেবীর নাক পতিত হওয়ায় মহাপীঠ হয়েছে। এখানে ত্র্যম্বক নামে ভৈরব এবং সুনন্দা নামে দেবী অবস্থিত। এই দেবীকে অনেকে উগ্রতারা নামেও ডেকে থাকেন।

চট্টলে ভবানী (বাংলাদেশ)।

এই মহাপীঠ চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ডের নিকট চন্দ্রনাথ পাহাড়ে অবস্থিত। কেহ বলেন দেবীর ডান হস্ত, কেহ বলেন ডান হস্তের অর্ধেক এখানে পতিত হয়েছিল। এখানে দেবী ভবানী, ভৈরব চন্দ্র শেখর (চন্দ্রনাথ)।

ত্রিশোতায় ভ্রামরী (বাংলাদেশ)।

বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলার বোদা থানার শালবাড়ি গ্রামে তিস্তা নদীর তীরে এই মহাপীঠ অবস্থিত। এখানে সতীর বামপদ পতিত হয়। এখানে দেবী ভ্রামরী (অমরী), ভৈরবের নাম অমর (ঈশ্বর)।

জয়ন্তী রাজ্যে দেবী জয়ন্তী (বাম জঙ্ঘাপীঠ), বাংলাদেশ।

শ্রীহট্ট (সিলেট) শহর থেকে ৩৮ মাইল উত্তর-পূর্বে পর্বত পাদদেশে এই মহাপীঠ অবস্থিত। জয়ন্তীয়া রাজ্য ১৮টি পরগণায় বিভক্ত। তন্মধ্যে ফালজুর নামক পরগণায় বাউর ভাগ গ্রামে এই বাম জঙ্ঘাপীঠ অবস্থিত। দেবীর নাম জয়ন্তী, ভৈরবের নাম ক্রমদীশ্বর। জনসাধারণের নিকট এই পীঠ ফালজুরের কালীবাড়ি নামে আখ্যাত। দেবী জয়ন্তীর নামেই এই রাজ্যের নাম জয়ন্তীয়া।

শ্রীশৈলে (শ্রীহট্টে) মহালক্ষ্মী (বাংলাদেশ)।

শ্রীহট্টে (সিলেট) সীতার গ্রীবা পতিত হয়। এখানে দেবীর নাম মহালক্ষ্মী, ভৈরবের নাম সম্বরানন্দ (মতান্তরে সর্বানন্দ) শ্রীহট্টে শহর থেকে দেড়-দু' মাইল দক্ষিণে গোটাটিকর নামে একটি স্থান আছে। তথায় শিবটিলার ওপর ভৈরব সম্বরানন্দ এবং এর কাছেই জৈনপুর নামক স্থানে পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী মহালক্ষ্মী অধিষ্ঠিতা আছেন। চৈত্র মাসের আশোকাষ্টমী তিথিতে দেবীর মন্দির সম্মুখে এবং শিব চতুর্দশীতে ভৈরব সম্বরানন্দের মন্দিরে মেলা হয়।

করতোয়াতটে (বাংলাদেশ)।

করতোয়া নদীর তীরে দেবীর বাম কর্ণ পতিত হয়েছে। এখানে ভৈরবের নাম বামেশ বা বামন, দেবীর নাম অপর্ণা। এখানে তন্ত্রচূড়ামণি ও অন্নদামঙ্গলে কিছু পাঠান্তর লক্ষ্য করা যায়। তন্ত্রচূড়ামণিতে আছে 'তল্পং' অর্থে শয্যা, আসানাদি কিন্তু অন্নদামঙ্গলে আছে বাম কর্ণ। উত্তরবঙ্গে বগুড়া জেলায় ভবানীপুর গ্রামে এই মহাপীঠ অবস্থিত। নাটোররাজ সাধক প্রবর মহারাজ রামকৃষ্ণ এই পীঠস্থান তপস্যা করতেন।

যশোরে যশোরেশ্বরী (বাংলাদেশ)।

যশোরে দেবীর করকমল পতিত হয় তথায় দেবীর নাম যশোরেশ্বরী এবং ভৈরবের নাম চণ্ড। এখানে সাধক সিদ্ধি লাভ করেন। বর্তমান সাতক্ষীরা জেলাশহর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে শ্যামনগর উপজেলায় যশোরেশ্বরী পীঠস্থান অবস্থিত। এখানে প্রাচীন যশোর রাজ্যের রাজধানী ছিল। ভারতচন্দ্র রায়ের কবিতায় যশোর নগর এবং যশোরেশ্বরীর সেবক মহারাজ প্রতাপাদিত্যের নাম অমর হয়ে আছে।

শ্রীশ্রী আদিনাথ মন্দির

কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলায় অবস্থিত শ্রীশ্রী আদিনাথ মন্দির। আদিনাথ মূলতঃ শিবের আরেক নাম। অর্থাৎ হিন্দুর প্রধান আরাধ্য দেবতাদের অন্যতম শ্রীশ্রী শিবকে ঘিরেই এ তীর্থের উৎপত্তি ও প্রসারতা।

শিব মহাকালরূপী মহেশ্বর। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। অতি অল্পে তুষ্ট। তাঁর মত দেবতা মেলা ভার। সামান্য বিল্বপত্র আর জল পেলেই তিনি তুষ্ট হন। পুরাণে উল্লেখ আছে লঙ্কাধিপতি রাবণ একবার কঠোর তপস্যা করে শিবের আশীর্বাদ লাভ করেন। রাবণ তার আন্তরিক অভিপ্রায়ের কথা শিবের চরণে নিবেদন করে জানালেন কৈলাশের শিবকে লঙ্কার স্বর্ণমন্দিরে প্রতিষ্ঠা করবেন। শিব রাবণের প্রস্তাবে প্রথমে সম্মত হলেন না, কারণ কৈলাশ তাঁর অতীব প্রিয় জায়গা। রাবণ নাছোড়বান্দা, শিবকে কৈলাশে রেখে তিনি লঙ্কায় ফিরে যাবেন না। প্রয়োজনে সহস্র বছর শিবধ্যানে অতিবাহিত করবেন। রাবণ শিবের চরণে নিবেদন করলেন দেবী মহাশক্তিকে তিনি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেছেন। স্বর্গের দেবেন্দ্র ইন্দ্র দেবসহ সবাইকে তিনি লঙ্কায় নিয়ে এসেছেন, মহাদেব দয়া করে যদি লঙ্কায় না যান তাহলে রাবণের মহৎ ইচ্ছা পূর্ণ হবে না। রাবণের পীড়াপীড়িতে অবশেষে এক শর্তে আশুতোষ সম্মত হলেন। ভক্তপ্রবর রাবণের ইচ্ছা শিবকে স্বীয় স্কন্ধে বহন করে লঙ্কায় নিয়ে যাবেন। ঘটনাক্রমে রাবণের স্কন্ধে করা শিব মহেশখালীর এ স্থানে স্থিত হয় এবং সেই থেকে এটি হিন্দুদের একটি তীর্থভূমি। প্রতিবছর শিব চতুর্দশীতে দেশ-বিদেশের অনেক পুণ্যার্থীর সমাগম হয় এ তীর্থভূমিতে।

শ্রীশ্রী চণ্ডীতীর্থ মেধস মুনির আশ্রম

চট্টগ্রামের কালুরঘাট ব্রীজ পার হয়ে বোয়ালখালী উপজেলা সদর থেকে প্রায় ৮ কি. মি. দূরে মধ্যম করলডেঙ্গা গ্রামের করলডেঙ্গা পাহাড়ের মাথায় এই আশ্রমের অবস্থান। আশ্রমের মেইন গেইট থেকে প্রায় আধা কি. মি. হেঁটে গেলে উপরে উঠার সিঁড়ি পাওয়া যায় এবং প্রায় ১৪০ টি সিঁড়ি বেয়ে মূল মন্দিরে উঠতে হবে।

ইতিহাসঃ রামায়ণ মতে, ত্রেতাযুগে শ্রী রামচন্দ্র শরৎকালে দুর্গাপূজা করেছিলেন। তবে দুর্গাপূজার সূচনা হয় তারও অনেক আগে।

সত্যযুগে শত্রুদের চক্রান্তে ধার্মিক রাজা সুরথ তাঁর রাজ্য হারিয়ে এবং স্বজন পরিত্যক্ত সমাধি বৈশ্য উপস্থিত হয়েছিলেন বোয়ালখালীর এই মেধস মুনির আশ্রমে। মেধাশ্রম মুনিপদে তাঁরা তাঁদের দুঃখের কথা জানালেন। তখন রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্যের এই দুর্দশা দেখে মেধস মুনি তাঁদের মধুময়ী চণ্ডীর পূজা করতে উপদেশ দেন। রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য তখন মুনির উপদেশ মেনে মাটি দিয়ে দুর্গা প্রতিমা তৈরি করেছিলেন এবং দুর্গাপূজা করেছিলেন।

দেবী দুর্গার আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে শত্রুদের পরাস্ত করে নিজ রাজ্য উদ্ধারে সক্ষম হয়েছিলেন ধার্মিক রাজা সুরথ এবং সমাধি বৈশ্য লাভ করলেন পরম শান্তি। মূলতঃ তাঁদের হাত ধরেই বাংলায় প্রচলিত হয় দুর্গাপূজা রীতি। পুরাকালে এই আশ্রমের কথা বিভিন্ন শাস্ত্রে বর্ণিত থাকলেও বেদানন্দ স্বামী দৈববলে চট্টগ্রামের বোয়ালখালীর করলডেঙ্গার পাহাড়ে এই তীর্থভূমি আবিষ্কার করার পর সাধারণ মানুষের কাছে এর প্রচার শুরু হয়। বেদানন্দ স্বামীর উদ্যোগেই মুলত এই আশ্রমটি গড়ে ওঠে। প্রতিবছর মহালয়ার মাধ্যমে এই আশ্রমে দেবীপক্ষের সূচনা হয়। প্রায় ৬৮ একর বিশাল জায়গা জুড়ে নির্মিত এই আশ্রমটিতে চণ্ডী মন্দির, সীতা মন্দির, শিব মন্দির ও তারাকালী মন্দিরসহ সর্বমোট ১০টি মন্দির আছে। এছাড়া সীতার পুকুর নামে একটি পুকুরও এই আশ্রমে রয়েছে। মনসকামনা পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে, মা চণ্ডীর দর্শনে, শানবাঁধানো সীতা পুকুর, নানা রকম গাছগাছালি আর পাহাড়ের অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে প্রতিবছর দেশ-বিদেশ থেকে পুণ্যার্থীরা ছুটে আসেন মা চণ্ডীর এই আশ্রমে। আশ্রমের পেছনে পুণ্যার্থী ও সাধু সন্ন্যাসীদের থাকার জন্য রয়েছে দোতলা ভবন।

পাঠ-১১

সমবেত প্রার্থনা

(প্রথমে একজন সুর ও ছন্দে পাঠ করবে তা শুনে অন্যরা সমবেত কণ্ঠে প্রার্থনা করবে ১ থেকে ১২ ক্রমিক পর্যন্ত)

১. ওঁ তৎ সৎ

২. যার যার ইষ্টনাম মনে মনে জপ করুন।

৩. ওঁ গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বর।
গুরুরেব পরমব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
ওঁ হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তুতে॥

৪. দেদীপ্যমান ব্রহ্ম, জগত ঈশ্বর আচার্য, দ্রষ্টাপুরুষ ঋষি, হৃদয়ে দীপ্তিমান দেবতা, সর্বপ্রাণপোষণপ্রদ বায়ু, স্থায়িত্ব বিনাশক মৃত্যু, সর্ব পরিব্যাপ্ত বিষ্ণু, জ্ঞান প্রদায়ক অগ্নি এবং সর্বদেবময় সদগুরুকে প্রলীন প্রণিপাতে নমস্কার ও প্রণাম করছি।

৫. ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎ সবিতুর্বরেণ্যং।
ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধীয়ো যো (ইয়ো) নঃ প্রচোদয়াৎ॥ গায়ত্রী মন্ত্র (ঋগ্বেদ ৩/৬২/১০)
যিনি বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ স্বরূপ, যিনি সচ্চিদানন্দ এবং আমাদের বুদ্ধির প্রেরণা দাতা, সেই সদালীলাময় জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বরের বরণীয় জ্যোতির্ময় তেজ বা রূপকে আমরা ধ্যান করছি। আমরা প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে সর্বদা জগতের কল্যাণময় কার্যে নিয়োজিত করেন।

৬. ওঁ অসতো মা সদ্গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়। আবির্আবীর্ম এধি॥ (বৃহদারণ্যক উপনিষদ ১/৩/২৮)
হে পরমেশ্বর তুমি আমাদেরকে অসৎ হতে সৎ পথে, অজ্ঞান-অন্ধকার হতে আলোর পথে এবং মৃত্যু হতে অমৃতলোকে নিয়ে যাও। হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম তুমি আমাদের নিকট উদ্ভাসিত হও।

৭. ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ, স্বস্তি নঃ পুষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নঃ তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥ (ঋগ্বেদ ১/৬২/৬)
বৃদ্ধশ্রবাঃ ইন্দ্র আমাদের দেহের মঙ্গল করুন। সর্বজ্ঞানাধার জগৎ-পোষক দেবতা আমাদের কল্যাণ বিধান করুন। হিংসানিবারক গরুড় আমাদের মঙ্গল করুন। দেবগুরু বৃহস্পতি আমাদের আধ্যাত্মিক মঙ্গল বিধান করুন।

৮ক. হে জগৎপিতা, তুমি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় নির্দেশনা দিয়েছো,
"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো, মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেব এষ্যসি যুক্ত্বৈবম্, আত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ (৯/৩৪)
যার সরলার্থ হলো: তুমি সর্বদা মনকে আমার চিন্তায় নিযুক্ত করো, আমাতে ভক্তিমান হও, আমাকে নমস্কার করো, আমাকে পূজা করো। এরূপে
শরণাগত হয়ে আমাতে মন সমাহিত করতে পারলে আমাকেই প্রাপ্ত হবে।"

৮খ. হে ভগবান, তোমার নির্দেশমতো আমরা তোমার চিন্তায় মনকে নিযুক্ত করেছি, তোমাতে ভক্তিমান হয়ে তোমাকে নমস্কার করে তোমারই প্রার্থনা
করছি। তুমি আমাদেরকে দুঃখভোগ থেকে মুক্তির জন্য কৃপা করো। তুমি আমাদের উপর শান্তি বর্ষণ করো। তুমি আমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করো।

৯ক. হে পরমকরুণাময় জগৎস্রষ্টা প্রতিপালক,
তোমার অসীম কৃপায় আমরা দুর্লভ মানবজীবন প্রাপ্ত হয়েছি। এ জীবনের সর্বোত্তম ব্যবহার করে আমরা যেন জগতের কল্যাণময় কাজে নিয়োজিত থাকতে পারি এবং তোমাকে পেতে পারি, এজন্য তুমি আমাদের কৃপা করো। হে প্রভু, সত্য, সুন্দর ও ন্যায় দ্বারা পরিচালিত হয়ে দুর্বলতা ছাড়িয়ে
দৃঢ় চিত্তে সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখা ও রক্ষার জন্য তুমি আমাদের শক্তি, সাহস ও সামর্থ দান করো। তুমি আমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করো প্রভু।

৯খ. হে পরমেশ্বর ভগবান,
তোমার অশেষ কৃপায় আমরা মন্দির প্রাঙ্গনে ধর্মগ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে মঙ্গলময় জ্ঞান লাভের অপূর্ব সুযোগ পেয়েছি। এ শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে জড়িত সকলকে তুমি মঙ্গলময় সুখী জীবন কৃপা করো। সকলকে শান্তি বর্ষণ করো। হে দীনবন্ধু, তুমি আমাদের এ প্রার্থনা গ্রহণ করো।

৯গ. হে জগদীশ্বর আজ এ প্রার্থনায় আমরা যারা তোমার শরণাপন্ন হয়েছি, তুমি আমাদের সকলকে দুঃখভোগ থেকে মুক্তি দাও প্রভু। আমাদের আত্মীয়- স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী সকলের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন অটুট করো। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য তুমি আমাদের কৃপা করো এবং সামর্থ দান করো। হে প্রভু, তুমি আমাদের এ প্রার্থনা গ্রহণ করো।

১০. হে পরমেশ্বর- মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পে নিয়োজিত সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, মন্দির কমিটির সদস্য ও অভিভাবকবৃন্দসহ সকলকে নিরোগ দেহ দান করো। সকলকে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা চর্চার উন্নয়নে কাজ করার সামর্থ দান করো। তুমি সকলকে কৃপা বর্ষণ করো।

১১. ওঁ সর্বেবাং মঙ্গলাং ভুয়াৎ, সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণী পশ্যন্তু, মা কশ্চিৎ দুঃখভাক ভবেৎ
সকলের মঙ্গল হউক, সকলে নিরাময় হউক, সকলে সকলকে উত্তম বন্ধু রূপে দর্শন করুক, কেহ যেন দুঃখভাগী না হয়

১২. ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ ভবেৎ।
পূর্ণং তৎ সর্বং ভবতু ত্বৎ প্রসাদাৎ জগদ্গুরো॥
এ মন্ত্রাদি পাঠকালে আমার যে যে অক্ষরাদি পরিভ্রষ্ট বা চ্যুত হয়েছে এবং যা যা মাত্রাহীন বা ছন্দপতনাদি ত্রুটি হয়েছে, হে জগদ্গুরু ভগবান আচার্যদেব, তোমার কৃপায় সে সমস্তই পূর্ণ হউক।

১৩. ওঁ দ্যৌঃ শান্তি অন্তরিক্ষং শান্তিঃ,
পৃথিবী শান্তিঃ আপঃ শান্তিঃ ওষধয়ঃ শান্তিঃ।
বনস্পতয়ঃ শান্তিঃ বিশ্বে দেবা শান্তিঃ,
ব্রহ্ম শান্তিঃ সর্বং শান্তিঃ শান্তিঃ এব শান্তিঃ সা মা শান্তঃ এধি॥
ওঁ শান্তি ঃ শান্তি ঃ শান্তিঃ। (যজুর্বেদ, ৩৬/১৭)।

বিশেষ সমবেত প্রার্থনার নমুনা

ক) জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিশেষ প্রার্থনার অংশ-
হে ঈশ্বর, আজ এ মন্দিরের শিক্ষার্থী শ্রী/শ্রীমতি.. আজকের মতো সুন্দর দিনে, এর শুভ জন্মদিন। ....বছর পূর্বে তুমি তাকেই দুর্লভ মানবজীবন দান করে পৃথিবীর আলো-বাতাসে এনেছো। আমরা তোমার কাছে তার সুন্দর ভবিষ্যত জীবনের জন্য কৃপা প্রার্থনা করছি। তুমি তার দুঃখ দূর করো। তার মঙ্গলময় কল্যাণকর জীবন কৃপা করো। সকল দুর্বলতা কাটিয়ে সে যেন দৃঢ়ভাবে তার সুন্দর ভবিষ্যত গড়তে পারে সেজন্য তাকে তুমি অসীম সাহস, ধৈর্য্য ও সামর্থ দান করো। হে প্রভু, আমাদের এ প্রার্থনা তুমি গ্রহণ করো।

খ) যে কোনো আনন্দের খবর প্রাপ্তিতে বিশেষ প্রার্থনার অংশ-
হে পরমেশ্বর ভগবান-
এ মন্দিরের অন্তর্গত শ্রী/শ্রীমতি.................................,পিতা/স্বামী....................................., মাতা................................ (আনন্দ খবরের বর্ণনা)। তাঁর এ সুখবরে আমরা খুবই আনন্দিত ও আবেগাপ্লুত। তাঁর এ আনন্দে আমরা তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। হে প্রভু, তুমি তাঁকে দুঃখভোগ লাঘব করে নিরোগ দেহ কৃপা করো। ভবিষ্যতে তিনি যেন তোমাতেই ব্রতী হয়ে রাষ্ট্র ও সমাজের মঙ্গলময় কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারে সে জন্য তুমি তাঁকে কৃপা করো এবং মানুষের জন্য কাজ করার অসীম সাহস, ধৈর্য্য ও সামর্থ দান করো। হে প্রভু, আমাদের এ প্রার্থনা তুমি গ্রহণ করো।

গ) মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তিতে-
হে পরমেশ্বর, এ মন্দিরের সাথে সংযুক্ত...........................পিতা/স্বামী.....................মাতা....................... গত........................... তারিখে......................... ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে পরলোক/দিব্যধাম গমন করেছেন। ওঁ দিব্যান্ লোকান্ সঃ গচ্ছতু/গচ্ছতি। আমরা তাঁর আত্মার সদগতির জন্য তোমার কৃপা প্রার্থনা করছি প্রভু। (মৃতের জীবিত অবস্থায় কর্মকা-ের বর্ণনা) তিনি নিরহংকারী, বন্ধুবৎসল, ন্যায়পরায়ণ এবং পরোপকারী মানুষ ছিলেন। সমাজের উন্নয়নের জন্য এবং মানুষের মঙ্গলের জন্য তিনি অনেক ভাল কাজ করেছেন। তাঁকে তুমি স্বর্গবাসী করো প্রভু। তাঁর বিদেহী আত্মাকে অমৃতলোক দান করো প্রভু। আমরা সকলে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদ্যসদেরকে গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। হে প্রভু, তাঁর পরিবারের সকলকে এ গভীর শোক সহ্য করার জন্য অসীম শক্তি, ধৈর্য্য ও সামর্থ দান করো। হে প্রভু, তুমি আমাদের এ প্রার্থনা গ্রহণ করো।

ঘ) যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী বা গোলযোগের কারণে বিশেষ প্রার্থনার অংশ
হে ভগবান,..কারণে, আজ সারা বিশ্বের/দেশের মনুষ্যকুল মহা বিপর্যস্ত। এই মহাদুর্যোগে ইতোমধ্যে বিশ্বে/বাংলাদেশে................জন মৃত্যুবরণ করেছেন। (ওঁ দিব্যান্ লোকান্ সং গচ্ছতু/গচ্ছতি।)। পরলোকগমনকারী সকলকে তুমি স্বর্গধামে স্থান দিয়ে অমর করো। পরলোকগমনকারী সকলের স্বজনকে শোক সহ্য করার জন্য অসীম শক্তি, ধৈর্য্য ও সামর্থ দান করো। আমাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী, চিকিৎসক, সাংবাদিক, পুলিশ, প্রশাসক, বিচারকসহ সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষ, যারা মানুষের কল্যাণে কাজ করছে, তাদেরকে তুমি অসীম শক্তি, ধৈর্য্য ও সামর্থ দান করো। হে প্রভু, তুমি আমাদের এ প্রার্থনা গ্রহণ করো।

প্রার্থনা সংগীত

প্রার্থনা সংগীত-১

অসৎ হইতে মোরে সৎ পথে নাও,
জ্ঞানের আলোক জ্বেলে আঁধার ঘোচাও ।।
মরণের ভয় যাক অমর কর,
দেখা দিয়ে ভগবান শঙ্কা হর ।।
করুণা আশিস ঢালো রুদ্র শিরে,
চিরদিন থাকো মোর জীবন ঘিরে ।।
ঝরিয়া পড়ুক শান্তি চরাচরময়,
চিরশান্তি পরিমলে ভরুক হৃদয় ।।

প্রার্থনা সংগীত-২

তুমি নির্মল কর, মঙ্গল করে
মলিন মর্ম মুছায়ে ।।
তব, পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক মোর
মোহ কালিমা ঘুচায়ে?
লক্ষ্য শূন্য লক্ষ বাসনা
ছুটিছে গভীর আঁধারে,
জানি না কখন ডুবে যাবে কোন
অকূল-গরল-পাথারে ।
প্রভু বিশ্ব-বিপদহন্তা,
তুমি দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা;
তব, শ্রীচরণ তলে নিয়ে এস মোর,
মত্ত-বাসনা গুছায়ে!
আছ, অনল-অনিলে, চিরনভোনীলে,
ভূধর সলিলে, গহনে;
আছ বিটপীলতায়, জলদের গায়,
শশী তারকায় তপনে ।
আমি, নয়নে বসন বাঁধিয়া,
বসে আঁধারে মরিগো কাঁদিয়া;
আমি দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু,
দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে।

প্রার্থনা সংগীত-৩

আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর ।।
মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগনমাঝে,
বিশ্বজগত মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে।
গ্রহতারক চন্দ্রতপন ব্যাকুল দ্রুত বেগে,
করিছে পান, করিছে স্নান, অক্ষয় কিরণে।
ধরণী' পরে ঝরে নির্ঝর, মোহন মধুশোভা,
ফুলপলব-গীতবন্ধ-সুন্দর-বরনে।
বহে জীবন রজনীদিন চিরনূতনধারা,
করুণা তব অবিশ্রাম জনমে মরণে।
স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তি কোমল করে প্রাণ,
কত সান্ত্বন করো বর্ষণ সন্তাপহরণে।
জগতে তব কী মহোৎসব, বন্দন করে বিশ্ব
শ্রীসম্পদ ভূমাস্পদ নির্ভয়শরণে।

শ্রীশ্রী নাম সংকীর্তন-৪

(হরি) হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ।।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন ।।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত সীতা।
হরি, গুরু বৈষ্ণব, ভাগবত, গীতা ।।
শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, ভট্ট, রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ ।।
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভিষ্ট পুরণ ।।
এই ছয় গোসাঞির যার, মুঞি তার দাস।
তাঁ'সবার পদরেণু-মোর পঞ্চগ্রাস ।।
তাদের-চরণ-সেবি ভক্তসনে বাস।
জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ ।।
এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈলা বাস।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ ।।
আনন্দে বল হরি, ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরুবৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন ।।
শ্রীগুরুবৈষ্ণব পাদপদ্ম করি আশ।
(হরি) নাম-সংকীর্তন কহে নরোত্তম দাস ।।

প্রার্থনা কীর্তন-৫

ভব সাগর তারণ কারণ হে।
রবি নন্দন বন্ধন খণ্ডন হে।
শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥
হৃদি কন্দর তামস ভাস্কর হে।
তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে।
পরব্রহ্ম পরাৎপর বেদ ভণে।
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে॥
মন বারণ শাসন অঙ্কুশ হে।
নরত্রাণ তরে হরি চাক্ষুষ হে।
গুণগান পরায়ণ দেবগণে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥
কুলকুণ্ডলিনী ঘুম ভঞ্জক হে ।
হৃদিগ্রন্হি বিদারণ কারক হে।
মম মানস চঞ্চল রাত্রি দিনে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥
রিপুসূদন মঙ্গলনায়ক হে।
সুখ শান্তি বরাভয় দায়ক হে।
ত্রয় তাপ হরে তব নাম গুনে ।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥
অভিমান প্রভাব বিনাশক হে।
গতিহীন জনে তুমি রক্ষক হে।
চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তি ধনে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥
তব নাম সদা শুভ সাধক হে।
পতিতাধাম মানব পাবক হে।
মহিমা তব গোচর শুদ্ধমনে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥
জয় সদগুরু ঈশ্বর প্রাপক হে।
ভব রোগ বিকার বিনাশক হে।
মন যেন রহে তব শ্রীচরণে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥

প্রার্থনা কীর্তন-৬

(রাগিনী গান্ধার; তাল সম)

রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর।
জীবন মরণে গতি আর নাহি মোর॥
যমুনা-পুলিনে কেলি কদম্বের বন।
রতন-বেদীর পর বসাব দু'জন॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবৃন্দ॥
শ্যাম গৌরী অঙ্গে দিব চুয়া চন্দনের গন্ধ।
চামর ঢুলাব করে হেরিব মুখচন্দ্র॥
মালতী ফুলের মালা গাথি দিব গলে।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পুর তাম্বুলে॥
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য প্রভূর দাসের অনুদাস।
নরোত্তম দাস করে সেবা অভিলাষ॥

প্রার্থনা কীর্তন-৭

সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে,
শোনো শোনো পিতা।
কহো কানে কানে,
শুনাও প্রাণে প্রাণে মঙ্গলবারতা॥
ক্ষুদ্র আশা নিয়ে রয়েছে বাঁচিয়ে,
সদাই ভাবনা।
যা-কিছু পায় হারায়ে যায়,
না মানে সান্ত্বনা॥
সুখ-আশে দিশে দিশে,
বেড়ায় কাতরে।
মরীচিকা ধরিতে চায়,
এ মরুপ্রান্তরে॥
ফুরায় বেলা, ফুরায় খেলা,
সন্ধ্যা হয়ে আসে।
কাঁদে তখন আকুল-মন,
কাঁপে তরাসে॥
কী হবে গতি, বিশ্বপতি,
শান্তি কোথা আছে।
তোমারে দাও, আশা পূরাও,
তুমি এসো কাছে॥

শ্রীশ্রী কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম

শ্রীশ্রী কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম (০৮)

নারায়ণের প্রণাম

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো- ব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
পাপোহ হং পাপকর্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো হরি॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দৈবকী নন্দনায় চ।
অশেষ ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগত্পতে।
গোপেশ গোপীকাকান্ত রাধাকান্ত নমোহস্তু তে॥

শ্রীশ্রী কৃষ্ণের অষ্টোত্তর-শতনাম

জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর।
কৃষ্ণচন্দ্র কর কৃপা করুণা-সাগর॥
জয় রাধে গোবিন্দ গোপাল বনমালী।
শ্রীরাধার প্রাণধন মুকুন্দ-মুরারী॥
হরিনাম বিনে রে (ভাই) গোবিন্দ নাম বিনে।
বিফলে মনুষ্য জন্ম যায় দিনে দিনে॥
দিন গেল মিছা কাজে রাত্রি গেল নিদ্রে।
না ভজিনু রাধাকৃষ্ণ-চরণার বৃন্দে॥
কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু।
মিছা মায়ায় বদ্ধ হয়ে বৃক্ষসম হৈনু॥
ফলরূপে পুত্র-কন্যা ডাল ভাঙ্গি পড়ে।
কালরূপে সংসারেতে পক্ষী বাসা করে॥
যখন কৃষ্ণ জন্ম নিলেন দৈবকী উদরে।
মথুরাতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে॥
বসুদেব রাখি আইল নন্দের মন্দিরে।
নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ দিনে দিনে বাড়ে॥

শ্রীনন্দ রাখিল নাম নন্দের নন্দন। ১
যশোদা রাখিল নাম যাদু বাছাধন॥ ২
উপানন্দ নাম রাখে সুন্দর-গোপাল। ৩
ব্রজবালক নাম রাখে-ঠাকুর রাখাল॥ ৪
সুবল রাখিল নাম ঠাকুর কানাই। ৫
শ্রীদাম রাখিল নাম রাখাল-রাজা ভাই॥ ৬
ননীচোরা নাম রাখে যতেক গোপিনী। ৭
কালসোনা নাম রাখে রাধাবিনোদিনী॥ ৮
কুব্জা রাখিল নাম পতিত-পাবন-হরি। ৯
চন্দ্রাবলী নাম রাখে মোহন-বংশীধারী॥ ১০
অনন্ত রাখিল নাম অন্ত না পাইয়া। ১১
কৃষ্ণ নাম রাখে গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া॥ ১২
অথ্বমুনি নাম রাখে দেবচক্রপাণি। ১৩
বনমালী নাম রাখে বনের হরিণী॥ ১৪
গজহস্তী নাম রাখে শ্রীমধুসূদন। ১৫
অজামিল নাম রাখে দেব নারায়ণ॥ ১৬
পুরন্দর নাম রাখে দেব শ্রীগোবিন্দ। ১৭
দ্রৌপদী রাখিল নাম দেব দীনবন্ধু॥ ১৮
সুদাম রাখিল নাম দারিদ্র্য-ভঞ্জন। ১৯
ব্রজবাসী নাম রাখে ব্রজের জীবন॥ ২০
দর্পহারী নাম রাখে অর্জ্জুন সুধীর। ২১
পশুপতি নাম রাখে গরুড় মহাবীর।। ২২
যুধিষ্ঠির নাম রাখে দেব যদুবর। ২৩
বিদুর রাখিল নাম কাঙ্গালের ঠাকুর॥ ২৪
বাসুকী রাখিল নাম দেব-সৃষ্টি-স্থিতি। ২৫
ধ্রুবলোকে নাম রাখে ধ্রুবের সারথী॥ ২৬
নারদ রাখিল নাম ভক্ত-প্রাণধন। ২৭
ভীষ্মদেব নাম রাখে লক্ষ্মী-নারায়ণ॥ ২৮
সত্যভামা নাম রাখে সত্যের সারথী। ২৯
জাম্ববতী নাম রাখে দেব যোদ্ধাপতি॥ ৩০
বিশ্বামিত্র নাম রাখে সংসারের সার। ৩১
অহল্যা রাখিল নাম পাষাণ-উদ্ধার॥ ৩২
ভৃগমুনি নাম রাখে জগতের হরি। ৩৩
পঞ্চমুখে রামনাম গান ত্রিপুরারি॥ ৩৪
কুঞ্জকেশী নাম রাখে বলী সদাচারী। ৩৫

প্রহ্লাদ রাখিল নাম নৃসিংহ-মুরারী ॥ ৩৬
বশিষ্ঠ রাখিল নাম মুনি-মনোহর। ৩৭
বিশ্বাবসু নাম রাখে নবজলধর ॥ ৩৮
সম্বর্ত্তক রাখে নাম গোবর্দ্ধনধারী। ৩৯
প্রাণপতি নাম রাখে যত ব্রজনারী ॥ ৪০
অদিতি রাখিল নাম আরতি-সূদন। ৪১
গদাধর নাম রাখে যমল-অর্জ্জুন ॥ ৪২
মহাযোদ্ধা নাম রাখে ভীম মহাবল। ৪৩
দয়ানিধি রাখে নাম দরিদ্র সকল ॥ ৪৪
বৃন্দাবন-চন্দ্র নাম রাখে বৃন্দাদূতি। ৪৫
বিরজা রাখিল নাম যমুনার পতি ॥ ৪৬
বাণীপতি নাম রাখে গুরু বৃহস্পতি। ৪৭
লক্ষ্মীপতি রাখে নাম সুমন্ত্র সারথি ॥ ৪৮
সন্দীপনি নাম রাখে দেব অন্তর্য্যামী। ৪৯
পরাশর নাম রাখে ত্রিলোকের স্বামী ॥ ৫০
পদ্মযোনি নাম রাখে অনাদির আদি। ৫১
নট-নারায়ণ নাম রাখিল সম্বাদি ॥ ৫২
হরেকৃষ্ণ নাম রাখে প্রিয় বলরাম। ৫৩
ললিতা রাখিল নাম দুর্ব্বাদলশ্যাম ॥ ৫৪
বিশাখা রাখিল নাম অনঙ্গমোহন। ৫৫
সুচিত্রা রাখিল নাম শ্রীবংশীবদন ॥ ৫৬
আয়ান রাখিল নাম ক্রোধ-নিবারণ। ৫৭
চণ্ডাকেশী নাম রাখে কৃতান্ত-শাসন ॥ ৫৮
জ্যোতিষ্ক রাখিল নাম নীলকান্তমণি। ৫৯
গোপীকান্ত নাম রাখে সুদাম-ঘরণী ॥ ৬০
ভক্তগণ নাম রাখে দেব জগন্নাথ। ৬১
দুর্ব্বাসা রাখিল নাম অনাথের নাথ ॥ ৬২
রাসেশ্বর নাম রাখে যতেক মালিনী। ৬৩
সর্ব্ব-যজ্ঞেশ্বর নাম রাখেন শিবানী ॥ ৬৪
উদ্ধব রাখিল নাম মিত্র-হিতকারী। ৬৫
অক্রুর রাখিল নাম ভব-ভয়হারী ॥ ৬৬
গুঞ্জমালী নাম রাখে নীল-পীতবাস। ৬৭
সর্ব্ববেত্তা রাখে নাম দ্বৈপায়ণ ব্যাস ॥ ৬৮
অষ্টসখী নাম রাখে ব্রজের ঈশ্বর। ৬৯
সুরলোকে রাখে নাম অখিলের সার ॥ ৭০
বৃষভানু নাম রাখে পরম ঈশ্বর। ৭১
স্বর্গবাসী রাখে নাম দেব পরাৎপর ॥ ৭২
পুলোমা রাখিল নাম অনাথের সখা। ৭৩
রসসিন্ধু নাম রাখে সখী চিত্রলেখা ॥ ৭৪
চিত্ররথ নাম রাখে অরাতি-দমন। ৭৫
পুলস্ত্য রাখিল নাম নয়ন-রঞ্জন ॥ ৭৬
কশ্যপ রাখেন নাম রাস-রাসেশ্বর। ৭৭
ভাণ্ডারীক নাম রাখেন পূর্ণ-শশধর ॥ ৭৮
সুমালী রাখিল নাম পুরুষ-প্রধান। ৭৯
পুরঞ্জন নাম রাখে ভক্তগণ-প্রাণ ॥ ৮০
রজকিনী নাম রাখে নন্দের-দুলাল। ৮১
আহ্লাদিনী নাম রাখে ব্রজের-গোপাল ॥ ৮২
দেবকী রাখিল নাম নয়নের মণি। ৮৩
জ্যোতির্ম্ময় নাম রাখে যাজ্ঞবল্ক্য মুনি ॥ ৮৪
অত্রিমুনি নাম রাখে কোটি-চন্দ্রেশ্বর। ৮৫
গৌতম রাখিল নাম দেব বিশ্বম্ভর ॥ ৮৬
মরীচি রাখিল নাম অচিন্ত্য-অচ্যুত। ৮৭
জ্ঞানাতীত নাম রাখে সৌনকাদি সুত।। ৮৮
রুদ্রগণ নাম রাখে দেব-মহাকাল। ৮৯
বসুগণ রাখে নাম ঠাকুর দয়াল ॥ ৯০
সিদ্ধগণ নাম রাখে পুতনা-নাশন। ৯১
সিদ্ধার্থ রাখিল নাম কপিল তপোধন ॥ ৯২
ভাণ্ডরি রাখিল নাম অগতির গতি। ৯৩
মৎস্যগন্ধা নাম রাখে ত্রিলোকের পতি ॥ ৯৪
শুক্রাচার্য্য নাম রাখে অখিল-বান্ধব। ৯৫
বিষ্ণুলোকে নাম রাখে দেব শ্রীমাধব ॥ ৯৬
যদুগণ নাম রাখে যদুকুলপতি। ৯৭
অশ্বিনীকুমার নাম রাখে সৃষ্টি-স্থিতি ॥ ৯৮
অর্য্যমা রাখিল নাম কাল-নিবারণ। ৯৯
সত্যবতী নাম রাখে অজ্ঞান-নাশন ॥ ১০০
পদ্মাক্ষ রাখিল নাম ভ্রমর-ভ্রমরী। ১০১
ত্রিভঙ্গ রাখিল নাম যত সহচরী ॥ ১০২
বঙ্কচন্দ্র নাম রাখে শ্রীরূপমঞ্জরী। ১০৩
মাধুরী রাখিল নাম গোপী-মনোহারী ॥ ১০৪
মঞ্জুমালী নাম রাখে অভীষ্ট-পুরণ। ১০৫
কুটিলা রাখিল নাম মদন-মোহন ॥ ১০৬
মঞ্জরী রাখিল নাম কর্ম্মবন্ধ-নাশ। ১০৭
ব্রজবধূ নাম রাখে পূর্ণ-অভিলাষ ॥ ১০৮

পাঠ-১২

নৈতিক শিক্ষায় ধর্মীয় উপাখ্যান

দধীচি মুনির ত্যাগ ও উদারতা

অনেক অনেক কাল আগের কথা। নৈমিষারণ্য নামে একটি বিখ্যাত তপোবন ছিল। সেখানে মুনি-ঋষিরা তপস্যা করতেন। শিক্ষার্থীরা গুরুগৃহে এসে শিক্ষা লাভ করত। সেই নৈমিষারণ্যে দধীচি নামের এক মুনি বাস করতেন। কঠোর সাধনা করতেন তিনি। আর সকলের জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করতেন।

সে সময় বৃত্র নামে এক অসুর খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। তদুপরি দেবতা শিবকে কঠোর সাধনা দ্বারা সন্তুষ্ট করে তিনি একটি বর আদায় করে নেন। দেবতারা কারো প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হলে তাকে বর দেন। তা সে দেব, মানব, দানব যেই হোক। বৃত্র শিবের কাছ থেকে যে বরটি পেয়েছিলেন তা হলো - দেবতা বা অসুরদের অস্ত্রের আঘাতে তাঁর মৃত্যু হবে না।

শিবের বর পেয়ে বৃত্রাসুর আরও প্রবল হয়ে উঠলেন। তিনি দেবতাদের স্বর্গরাজ্য জয় করে নিলেন। সেখান থেকে দেবরাজ ইন্দ্রসহ সকল দেবতাকে তাড়িয়ে দিলেন।

তখন দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গ থেকে বিতাড়িত দেবতাদের নিয়ে গেলেন শিবের কাছে। শিব তখন তাঁদের বললেন, 'তোমরা বিষ্ণুলোকে যাও। সেখানে বিষ্ণু তোমাদের উপযুক্ত পরামর্শ দেবেন।'

শিবের কথা মতো দেবতারা গেলেন বিষ্ণুর কাছে। তাঁরা বিষ্ণুর স্তব করলেন। দেবতাদের স্তবে সন্তুষ্ট হলেন বিষ্ণু। তিনি দেবতাদের বললেন, 'তোমরা নৈমিষারণ্যে দধীচি মুনির কাছে যাও। তাঁর উদারতায় তোমাদের মঙ্গল হবে।'

তখন বিষ্ণুর পরামর্শ অনুসারে দেবতাদের নিয়ে দেবরাজ ইন্দ্র নৈমিষারণ্যে দধীচি মুনির কাছে গেলেন।

সব শুনে দধীচি মুনি বললেন, 'শিবের বরে বলীয়ান বৃত্রাসুরকে কোনো অস্ত্র দিয়ে বধ করা যাবে না। তাই অন্য উপায় বের করতে হবে।'

একটু ভেবে বললেন, 'আমি একটি উপায় বের করেছি।'

ইন্দ্র বললেন, 'কী উপায় মুনিবর?'

দধীচি বললেন, 'আমি দেহ ত্যাগ করব।'

'মুনিবর!' দেবতারা আঁতকে উঠলেন।

দধীচি বললেন, 'শুনুন দেবরাজ, এ নশ্বর দেহ তো একদিন বিনষ্ট হবেই। আপনাদের মঙ্গলের জন্য আজই না হয় তাকে ব্যবহার করি। আমি দেহত্যাগ করলে আমার হাড় দিয়ে অস্ত্র তৈরি করুন। তারপর তা দিয়ে বৃত্রাসুরকে বধ করুন। হাড় তো কোনো প্রচলিত অস্ত্র নয়।

তারপর দধীচির দেহের হাড় দিয়ে দেবতাদের প্রকৌশলী বিশ্বকর্মা বজ্র তৈরি করলেন। ইন্দ্র সেই বজ্র দিয়ে বৃত্রাসুরকে বধ করলেন। পুনরুদ্ধার করলেন স্বর্গরাজ্য। দধীচি মুনির এই ত্যাগ ও উদারতার কথা আজও অমর হয়ে আছে।

নৈতিক শিক্ষা : আমরাও মানুষ ও সমাজের মঙ্গলের জন্য নানাভাবে ত্যাগ ও উদারতার পরিচয় দিতে পারি।

প্রহ্লাদ ও হিরণ্যকশিপু

দৈত্যদের রাজা হিরণ্যকশিপু। তাঁর পুত্র প্রহ্লাদ। হিরণ্যকশিপু দেবতা বিষ্ণুর বিরোধী। কিন্তু প্রহ্লাদ হয়ে উঠলেন অতিশয় বিষ্ণুভক্ত। একথা জানতে পেরে হিরণ্যকশিপু ভীষণ রেগে গেলেন। তিনি প্রহ্লাদকে ডেকে বললেন, 'বিষ্ণু আমার শত্রু। তোমাকে বিষ্ণু নাম ছাড়তে হবে।'

প্রহ্লাদ : তা কী করে সম্ভব, বাবা? তিনি যে ঈশ্বর!

হিরণ্যকশিপু: বিষ্ণু দৈত্যদের শত্রু। তাই দৈত্যকুলে জন্মে তুমি বিষ্ণুনাম নিতে পারবে না।

প্রহ্লাদ: বাবা, শ্রীবিষ্ণু তো ঈশ্বর। ঈশ্বর কারো শত্রু হন না। তাই আমি তাঁর নাম ছাড়তে পারব না।

হিরণ্যকশিপু আরও রেগে গেলেন। কিন্তু কী করবেন? ছেলে তো! তাই তিনি তাকে গুরুমশাইয়ের নিকট পাঠালেন। যদি সংশোধন হয়। কিন্তু কোনো ফল হলো না। প্রহ্লাদ আগের মতোই বিষ্ণুনাম জপতে লাগলেন। হিরণ্যকশিপু আর সহ্য করতে পারছেন না। তাই ছেলেকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলেন। রাজার আদেশে সেনারা তরবারি দিয়ে তাঁকে আঘাত করল। কিন্তু তাতে প্রহ্লাদ মরলেন না। তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হলো। আগুন নিভে গেল। গায়ে পাথর বেঁধে নদীতে ফেলা হলো। পাথর ভেসে উঠল। হাতির পায়ের নিচে ফেলা হলো। হাতি শুঁড় দিয়ে তাঁকে পিঠে তুলে নিল। তাঁকে সাপের ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। সাপ ফণা তুলে তাঁর চারদিকে নাচতে লাগল। বিষ মাখানো খাবার খাওয়ানো হলো। তাতেও প্রহ্লাদের মৃত্যু হলো না।

তারপর একদিন হিরণ্যকশিপু সিংহাসনে বসে আছেন। ক্রোধে তাঁর চোখ লাল। তিনি প্রহ্লাদকে ডাকলেন। প্রহ্লাদ বিষ্ণুনাম জপতে জপতে পিতার কাছে এলেন। হিরণ্যকশিপু ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে হুংকার দিয়ে বললেন, 'আমি নিজের হাতে তোমাকে মারব। দেখি কে তোমাকে বাঁচায়!'

প্রহ্লাদ: বিষ্ণুই আমাকে বাঁচাবেন।

হিরণ্যকশিপু: এখানে এসে বাঁচাবেন?

প্রহ্লাদ: তিনি তো সর্বত্রই আছেন, বাবা।

হিরণ্যকশিপু: সর্বত্র! এই স্ফটিক স্তম্ভের মধ্যেও ?

প্রহ্লাদ: অবশ্যই বাবা।

হিরণ্যকশিপু তখন হুংকার দিয়ে স্ফটিক স্তম্ভটি ভেঙে ফেললেন। আর তখনই তার মধ্য থেকে বের হয়ে এলেন এক ভয়ংকর মূর্তি। তাঁর নাম নৃসিংহ। তাঁর মুখটা সিংহের মতো। আর শরীরটা 'নৃ' অর্থাৎ মানুষের মতো। বের হয়েই হিরণ্যকশিপুকে দুই উরুর উপর রেখে হত্যা করলেন। প্রহ্লাদ করজোড়ে নৃসিংহরূপী বিষ্ণুর স্তব করতে লাগলেন।

'প্রহ্লাদ ও হিরণ্যকশিপু' গল্পের নৈতিক শিক্ষা হলো: যে-কোনো অবস্থায় সত্য কথা বলতে হবে। সত্যবাদী মৃত্যুকে ভয় পায় না। তার জীবনে অনেক বিপদ আসতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারই জয় হয়। তাই আমাদের সত্যবাদী হতে হবে।

একটি বালকের সরলতা

বহুদিন আগের কথা। এক গ্রামে একজন গরীব বিধবা বাস করতেন। তাঁর একটিমাত্র ছেলে ছিল। নাম হেমন্ত। হেমন্ত অত্যন্ত সরল ছেলে। সে পাঠশালায় গুরুমশায়ের কাছে পড়তে যেত। পাঠশালার পথে ছিল এক গভীর বন। বনের ভিতর দিয়ে যেতে হেমন্তের খুব ভয় করত। একদিন কেঁদে কেঁদে মাকে বলল, ''মা, একা একা পাঠশালায় যেতে আমার খুব ভয় করে। আমার সাথে একজন লোক দাও। নইলে আমি আর পাঠশালায় যেতে পারব না।''

হেমন্তের কথা শুনে মা বললেন, ''লোক কোথা পাব, বাছা? বনের ভেতর তোমার এক দাদা থাকে। তার নাম মধুসূদন। ভয় পেলে তুমি সেই মধুসূদনকে ডেকো। সে তোমার সঙ্গে যাবে।''

মায়ের কথা শুনে হেমন্তের মনে খুব আনন্দ হল। মনে অনেক সাহস পেল। পরদিন সে আবার বনের মধ্য দিয়ে রওনা হল। তারপর সে উচ্চস্বরে ডাকতে লাগল, ''মধুসূদন দাদা, ও-মধুসূদন দাদা। এস, আমার খুব ভয় করছে।''

হেমন্ত 'মধুসূদন' দাদা বলে ডাকছে আর ডাকছে, কিন্তু কেউ আসছে না। সে আরো জোরে জোরে ডাকতে শুরু করল। তার দৃঢ় বিশ্বাস, মধুসূদন দাদা আসবেই। তার মা যে তাকে বলেছে। মাকে খুব ভালবাসে, বিশ্বাস করে। মায়ের কথা কী মিথ্যা হয়?
ভগবানের এক নাম মধুসূদন। হেমন্তের মা এই মধুসূদনের কথাই বলেছিলেন। হেমন্তের সরল বিশ্বাসে ভগবান আর থাকতে পারলেন না। ভগবান তখন একটি বালকের রূপ ধরে হেমন্তের কাছে এলেন। তারপর হেমন্তকে বললেন, ''এই তো আমি এসেছি, তোমার কোন ভয় নেই, ভাই।"

হেমন্তের মনে অত্যন্ত আনন্দ। তার আর কোন ভয় নেই। প্রতিদিন মধুসূদন দাদা তাকে পাঠশালায় পৌছে দেয়, আবার ফেরার সময় বাড়ির কাছে রেখে যায়। পথে দুজনে মজার মজার গল্প করে।
এভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। তারপর একসময় গুরুমশায়ের মা মারা গেলেন। গুরুমশায় মায়ের শ্রাদ্ধ করবেন। ছাত্ররা যে যা পারছে তাই দিয়ে গুরুমশায়কে সাহায্য করছে। হেমন্তও সাহায্য করতে চাইল।
হেমন্ত বাড়ি এসে মায়ের কাছে সব বলল। মা বললেন, ''তুমি তো জান, আমরা খুব গরীব। আমাদের দেয়ার মত কিছুই নেই। তুমি তোমার মধুসূদন দাদাকে গুরুমশায়ের কথা বল।"

সরলমতি ছেলে হেমন্ত। মায়ের কথা শুনে পরদিন সে স্কুলে যাওয়ার পথে মধুসূদন দাদাকে সব কথা জানাল। মধুসূদন দাদা বললেন, "এতে কোন অসুবিধা হবে না। শ্রাদ্ধ কবে তাই বল।" হেমন্ত জানাল যে আগামী দিন শ্রাদ্ধ। মধুসূদন দাদা বললেন, "তুমি পাঠশালায় গিয়ে গুরুমশায়কে বলবে যে শ্রাদ্ধে যত দই লাগবে, তুমি তা দেবে।"
হেমন্ত পরদিন আবার পাঠশালায় গেল। তারপর গুরুমশায়কে বলল, ''শ্রাদ্ধে যত দই লাগবে আমি তা দেব।"
শ্রাদ্ধের দিন। সব ছেলে মিলেমিশে কাজ করছে। কিন্তু হেমন্তের দেখা নাই। দই নিয়ে সে আর আসছে না। গুরুমশায় খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। দই যদি না আসে তাহলে শ্রাদ্ধই যে পণ্ড হয়ে যাবে। ঠিক এই মুহূর্তেই হেমন্ত উপস্থিত হল দই নিয়ে। কিন্তু হেমন্তের হাতে ছোট একটি দইয়ের ভাঁড়। তাদেখে গুরুমশায় রেগে গেলেন। তিনি হেমন্তকে বললেন, ''তুই না বলেছিলি শ্রাদ্ধের সব দই দিবি? আর দই কই?"

হেমন্ত বলল, "আজ্ঞে, আমি তো ছোট মানুষ। ভারি বোঝা বইতে পারি না। তাই মধুসূদন দাদা এই ছোট ভাঁড়টি দিয়ে বলেছেন যে এতেই সকলের হবে।"
গুরুমশায় তো রেগে আগুন। তিনি হেমন্তকে অনেক তিরস্কার করলেন এবং খুব মারলেন। মার খেতে খেতে হেমন্ত অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

এদিকে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। হেমন্তকে মারার সময় একটি ছেলে দইয়ের ভাঁড় নিয়ে গিয়েছিল। সে ফিরে এসে বলল, "গুরুমশায়, সবাইকে দই দিচ্ছি। কিন্তু দই একটুও কমছে না।"
গুরুমশায় গিয়ে দেখলেন ব্যাপারটা ঠিকই। তিনি হেমন্তকে মারার জন্য অনুশোচনা করতে লাগলেন। তখন সকলে মিলে হেমন্তকে সুস্থ করে তুলল। এবার গুরুমশায় হেমন্তকে জিজ্ঞেস করলেন, ''সত্য করে বল দেখি বাবা, এ দই তুই কোথায় পেলি?"
হেমন্ত: 'মধুসূদন দাদা দিয়েছেন।'
গুরুমশায়: 'মধুসূদন দাদা! আমাকে দেখাতে পারিস তাকে?'
হেমন্ত: 'নিশ্চয়ই পারব, গুরুমশায়। চলুন না আমার সঙ্গে।'
গুরুমশায় ছাত্রের দল নিয়ে হেমন্তের সঙ্গে চললেন মধুসূদন দাদাকে দেখতে, কিন্তু তার দেখা পেলেন না। তবে দূর থেকে মধুসূদন দাদার কন্ঠ শোনা গেল। ''হেমন্ত, আজ আমি আসতে পারব না। তুমি সরল বিশ্বাসে আমাকে দেখতে পেয়েছ। তোমার গুরুমশায় ও অন্যান্য ছাত্রদের সে বিশ্বাস নেই। তাই তারা আমায় দেখতে পাবে না। তারা চলে গেলেই আমি তোমায় দেখা দেব।"

নৈতিক শিক্ষা : কথায় বলে, ''বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ।"

গণেশের মাতৃভক্তি

দেবী দুর্গার দুই ছেলে। কার্ত্তিক আর গণেশ। কার্ত্তিক ভাবতেন, তিনি মাকে বেশি ভালবাসেন। এই নিয়ে ছিল তাঁর গর্ব। কিন্তু গণেশ কিছু বলতেন না। চুপচাপ থাকতেন।

মা দুর্গা তাঁদের মনের কথা জানতেন। একদিন তিনি তাঁদের ডাকলেন। বললেন, "তোমাদের মধ্যে কে আগে সারা পৃথিবী ঘুরে আসতে পারবে? যে আগে ঘুরে আসতে পারবে, তাঁকে আমার রত্নমালা দেব।" কার্ত্তিক খুব খুশি। গণেশের দিকে তিনি তাকালেন আর মনে মনে হাসলেন। কারণ তাঁর বাহন ইঁদুর। কার্ত্তিক ভাবলেন গণেশের আগেই তিনি ময়ূরে চড়ে পৃথিবী ঘুরে আসতে পারবেন।

কার্ত্তিক বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু গণেশের মনে কোন চিন্তা নেই। তিনি জানতেন, মা বিশ্বময়ী। মায়ের বাইরে আবার বিশ্ব কী? তিনি হাত জোড় করে মাকে প্রদক্ষিণ করলেন। গণেশের এই মাতৃভক্তি দেখে মা খুশি হলেন। গণেশের গলায় তিনি পরিয়ে দিলেন তাঁর রত্নমালা।

নৈতিক শিক্ষা : নাস্তি মাতৃসম গুরু। অর্থাৎ জগতে মায়ের সমতুল্য কোন গুরু নেই। তাই মায়ের সন্তুষ্টির জন্য সন্তানকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি সজাগ থাকতে হবে।

মহিষাসুর বধ

শ্রীশ্রী চণ্ডী বা মহামায়া দেবতাসহ মানবকুলকে নানা বিপদ থেকে রক্ষা করেন। এ প্রসঙ্গে একটি কাহিনি বর্ণনা করা হলো। বহুকাল পূর্বে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে একবার ভীষণ যুদ্ধ বাধে। তখন দেবরাজ ইন্দ্র, আর দৈতরাজ মহিষাসুর। দানবেরা দেবতাদের পরাজিত করল। মহিষাসুরের খুব আনন্দ। বসল স্বর্গের সিংহাসনে।

স্বর্গহারা দেবতারা দেবরাজ ইন্দ্রের নেতৃত্বে প্রথমে গেলেন ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মা দেবতাদের দুঃখের কথা শুনলেন। বিষ্ণু ও শিব যেখানে বসে কথাবার্তা বলছেন, সেখানে গিয়ে উভয়কে বন্দনা করে দেবতাদের দুঃখের কথা জানালেন। ব্রহ্মার মুখে এমন মর্মান্তিক কথা শুনে বিষ্ণু আর মহেশ্বর প্রথমে ব্যথিত হলেন, তারপর ক্রুদ্ধমূর্তি ধারণ করলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবসহ অন্যান্য দেবতাদের শরীর থেকে ভয়ংকর তেজ বের হলো। সেই তেজ একত্রিত হয়ে এক দিব্য নারীমূর্তির সৃষ্টি হলো। ইনিই দেবী দুর্গা। তারপর দেবগণ তাঁকে নানান অস্ত্র ও অলংকার দান করলেন। এভাবে দুর্গা দেবী অপূর্ব সাজে সেজে উঠলেন। তখন গিরিরাজ হিমালয় দেবীর বাহনের জন্য দিলেন সিংহ। দেবতাগণ আনন্দে জয়ধ্বনি দিলেন, মুনিরা দেবীস্তব করলেন। অসুররা দেবীর সেই ভীষণ গর্জন শুনে তাঁর অভিমুখে তাড়াতাড়ি দ্রুতবেগে চলল। তারপর শুরু হলো দেবতা ও অসুরদের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ। মহিষাসুরের সেনাপতি চিক্ষুর ও চামরসহ চতুরঙ্গ সেনা নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগল। দেবী দুর্গা কিন্তু একা। তাতে কী? রণে মত্ত মহাশক্তিমান দেবীর নিঃশ্বাসে লক্ষ লক্ষ সৈন্য সৃষ্টি হলো। তখন একে একে চিক্ষুর, চামরসহ প্রায় সকলেই দেবীর অস্ত্রাঘাতে নিহত হলো। তারপর যুদ্ধে নামেন মহিষাসুর নিজে। দেবী দুর্গা আর মহিষাসুরের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়। অবশেষে দেবী শূলাঘাতে মহিষাসুরকে বধ করেন। দেবতারা তাঁদের স্বর্গরাজ্য আবার ফিরে পান। ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতা দেবী দুর্গার স্তব করতে লাগলেন।

সত্যবাদী সত্যকাম

ছান্দোগ্যোপনিষদের উপাখ্যান

সত্যকাম নামক একটি বালক ছিল, একদিন তাহার ইচ্ছা হইল কোন এক বড় ঋষির নিকট দীক্ষা লইয়া ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিবে। ভাবিতে ভাবিতেই মন স্থির করিয়া সে গৌতম ঋষির নিকট চলিয়া গেল। ঋষির সম্মুখে যুক্ত করে দাঁড়াইতে ঋষি জিজ্ঞাসা করিলেন, বালক, তুমি কি জন্য আসিয়াছ? তোমার নাম কী? বাড়ি কোথায়? বালক বলিল-"আমি ব্রহ্মজ্ঞান লাভেচ্ছু, হইয়া আসিয়াছি। আমার নাম সত্যকাম, বাড়ি কুশক্ষেত্র।" ঋষি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কোন বর্ণের? জান তো চারিটি বর্ণ আছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। তাহার মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার অধিকার একমাত্র ব্রাহ্মণ বর্ণেরই আছে। তোমার পিতার গোত্রটি বলিলেই আমি বুঝতে পারিব তুমি কোন বর্ণ হইতে আসিয়াছ।" সত্যকাম কহিল, "আচার্য্যদেব! আমি বাবার নাম জানি না। কাল মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিব।"

সত্যকাম বাড়ি আসিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিল "মা, আমার বাবার নাম কী? মা বলিল-" তোর বাবার নাম আমিও জানি না। যৌবন বয়সে নানাস্থানে নানাজনের সেবা করিয়াছি, বহু কষ্ট সাধন করিয়া তোকে পাইয়াছি। তোর বাবার নাম বলিতে পারিব না। আমার নাম জাবালা, তাই জাবালা পুত্র এই পরিচয় দিবি। পরদিন সকালবেলা সত্যকাম গুরুগৃহে আসিল ঋষিবর তাহার বাবার নাম শুনিতে চাহিলে বালক বলিল যে মা বলিয়াছে আমার বাবার নাম জানে না। আমার মায়ের নাম জাবালা। আমি জাবালা পুত্র, এই আমার পরিচয়। বালকের কথা শুনিয়া ঐ স্থানে যতগুলি ছাত্র, ঋষির সমীপে ব্রহ্মবিদ্যা পাঠ নিতে আসিয়াছিল সকলেই একটি বিদ্রুপের গুঞ্জন তুলিল, "লজ্জাহীন অনার্য্যের অহংকার" দেখিয়া।

ঋষি তখন আসন ছাড়িয়া উঠিলেন। দুই হাত খুলিয়া বালককে বুকে টানিয়া আনিয়া বলিলেন-"তুমি দ্বিজোত্তম তোমাকে দীক্ষা দিব।" সভার মধ্যে বাবার নাম জানিনা এত বড় সত্য কথা যে বলিতে পারে সেই সত্যবাদী। সত্যবাদীতাই ব্রাহ্মণত্বের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। এই সত্যবাদিতাই ব্রাহ্মণত্ব। জন্মে নহে। আজ তোমায় দীক্ষা দিব। ঋষির মুখের কথা কবিগুরু, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়-

"অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত।
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত।।"

পরবর্তীকালে সত্যকাম একজন শ্রেষ্ঠ ঋষি হইয়াছিলেন।

পাঠ-১৩

প্রশ্নোত্তরে সনাতন ধর্ম (প্রশ্নব্যাংক)

১। গীতা শাস্ত্রের সংকলক কে?

উত্তর: বেদব্যাস (কৃষ্ণদ্বৈপায়ন) ।

২। গীতার শ্লোক সংখ্যা কত?

উত্তর: ৭০০ (সাত শত)।

৩। গীতা কয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত?

উত্তর: ১৮ টি অধ্যায়ে।

৪। অধ্যায়গুলির নাম কী?

উত্তর: অর্জুন বিষাদ-যোগ, সাংখ্য যোগ, কর্মযোগ, জ্ঞান যোগ, কর্মসন্ন্যাস যোগ, অভ্যাসযোগ, জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ, অক্ষরব্রহ্ম-যোগ, রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য-যোগ, বিভুতি-যোগ, বিশ্বরূপ-দর্শন-যোগ, ভক্তিযোগ, ক্ষেত্র- ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগযোগ, গুণত্রয়-বিভাগযোগ, পুরুষোত্তম-যোগ, দৈবাসুর-সম্পদ-বিভাগযোগ, শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগ, মোক্ষযোগ।

৫। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কেন আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছিলেন?

উঃ অর্জুনের শোক ও মোহ দূর করার জন্য।

৬। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্রের বর্ণনা কে শুনিয়েছিলেন?

উত্তর: সঞ্জয়।

৭। কুরুক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেত্র বলা হয়েছে কেন?

উত্তর: এই স্থানটি একটি মহাপীঠ, দেবী ভদ্রকালী এবং ভৈরব এখানকার স্থাণু-ঈশ্বর।

৮। 'এক বাহিনী' বলতে সৈন্য সংখ্যা কত?

উত্তর: ৮১০ টি রথ, ৮১০টি হস্তী, ৮১০০টি অশ্ব এবং ৮১,০০০ জন পদাতিক সৈন্য।

৯। যিনি পাঁচ সহস্র যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করেন তাঁকে কি বলা হয়?

উত্তর: রথী।

১০। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সর্বপ্রথম কোন রাজা শঙ্খধ্বনি করেছিলেন?

উত্তর: দুর্যোধন।

১১। অর্জুনের রথের সারথি কে ছিলেন?

উত্তর: শ্রীকৃষ্ণ।

১২। চার আশ্রম কী কী?

উত্তর: ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস।

১৩। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় কী কী?

উত্তর: চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক।

১৪। ধর্ম সাধনায় পাঁচটি মহাব্রত কী কী?

উত্তর: অহিংসা, সত্য, অচৌর্য, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ।

১৫। অবিনাশী, নিত্য, অজ ও অব্যয় বস্তুটি কী?

উত্তর: আত্মা।

১৬। কোন কোন প্রয়োজনে শ্রীভগবান অবতার হয়ে অবতীর্ণ হন?

উত্তর: (১) সাধুদের পরিত্রাণ (২) ধর্মসংস্থাপন (৩) দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ ইত্যাদির প্রয়োজনে।

১৭। চাতুর্বর্ণ্য কী কী?

উত্তর: ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শুদ্র।

১৮। কর্ম কয় প্রকার ও কী কী?

উত্তর: দুই প্রকার:- সকাম কর্ম ও নিষ্কাম কর্ম।

১৯। মনুষ্য শরীরে নবদ্বার কী কী?

উত্তর: দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসিকা, মুখ, উপস্থ এবং পায়ু।

২০। বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডালে সমদর্শী যাঁরা হন, তাঁদেরকে কী বলে ?

উত্তর: যথার্থ পণ্ডিত।

২১। নির্বাণ লাভ বলতে কী বুঝায়?

উ: যাতে সর্বদুঃখের নাশ হয় এবং যা পরমানন্দস্বরূপ তাই নির্বাণ।

২২। নিত্য কর্ম বলিতে কি বুঝায়?

উত্তর: সন্ধ্যা-বন্দনাদি কর্ম।

২৩। তিন প্রকার অবতার কী কী?

উত্তর: ক) অংশ অবতার- যেমন বুদ্ধদেব।

খ) গুণ অবতার-ব্রহ্মা।

গ) শক্তি অবতার-ভার্গব ইত্যাদি।

২৪। গীতার একাদশতম অধ্যায়টির নাম কী?

উত্তর: বিশ্বরূপদর্শন -যোগ।

২৫। ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কি দান করেছিলেন?

উত্তর: দিব্য চক্ষু।

২৬। গুণ সকল কী কী?

উত্তর: সত্ত্ব,রজঃ এবং তমঃ।

২৭। সত্ত্ব গুণের লক্ষণ কী কী?

উত্তর: নির্মল,প্রকাশক,অনাময়, সুখাসক্তিরূপ এবং জ্ঞানাসক্তিরূপ।

২৮। রজোগুণের লক্ষণ কী কী?

উত্তর: তৃষ্ণা এবং অসঙ্গের জনক, ফল কর্মাসক্তি।

২৯। তমোগুণের লক্ষণ কী কী ?

উত্তর: তমোগুণ অজ্ঞান হতে জাত। মুগ্ধতাজন্য-প্রমাদ,আলস্য এবং নিদ্রা স্বভাব।

৩০। ত্রিগুণের সংক্ষিপ্ত কার্যাবলী কী কী?

উত্তর: সত্ত্বগুণ জীবকে সুখে সম্বন্ধিত করে, রজঃ কর্মে এবং তমঃ জ্ঞানকে আবৃত করে প্রমাদে সম্বন্ধিত করে।

৩১। তিন গুণের ফল-ক্রিয়া কী কী?

উত্তর: ক) সত্ত্ব হতে জ্ঞান জন্মে। খ) রজঃ হতে লোভ জন্মে। গ) তমঃ হতে অজ্ঞান, প্রমাদ এবং মোহ জন্মে

৩২। ত্রিগুণী জীবের গতি-লক্ষণ কিরূপ?

উত্তর: ক) সত্ত্বগুণী ব্যক্তিরা উর্ধ্ব স্বর্গাদি লোকে গমন করেন। খ) রাজসিক প্রকৃতির লোকেরা মধ্য ভূলোকে অবস্থান করেন। গ) তামসিক ব্যক্তিরা অধঃ পশ্বাদি লোকে গমন করে।

৩৩। এই তিন গুণকে অতিক্রম করলে কী লাভ হয়?

উত্তরঃ অমৃতত্ব লাভ হয়। (গীতা,১৪/২০)

৩৪। ত্রিবিধ নরকের দ্বার কী কী?

উত্তরঃ কাম, ক্রোধ এবং লোভ।

৩৫। চার বেদ কী কী?

উত্তরঃ ঋক্‌বেদ, সামবেদ, যজুঃবেদ ও অথর্ববেদ।

৩৬। চার উপবেদ কী কী?

উত্তর আয়ুর্বেদ, ধনুঃ বেদ, গান্ধর্ববেদ, অথর্ববেদ।

৩৭। উপাঙ্গ পাঁচটি কী কী?

উত্তরঃ তন্ত্র,পুরাণ,ইতিহাস,স্মৃতি এবং দর্শন।

৩৮। ক্ষত্রিয়ের শৌর্যাদি সাতটি স্বাভাবিক কর্ম কী কী?

উত্তরঃ শৌর্য,তেজ,ধৈর্য,দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, দান এবং ঈশ্বরভাব।

৩৯। বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম কী কী?

উত্তরঃ কৃষি,গোরক্ষা এবং বাণিজ্য।

৪০। শুদ্রের স্বাভাবিক কর্ম কী কী?

উত্তরঃ সেবা (পরিচর্যা)।

৪১। অর্জুনের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্বগুহ্যতম শেষ উপদেশটি কী ছিল?

উত্তরঃ হে অর্জুন,তুমি ভগবানের হও,তাঁর পুজা কর,তাঁকে নমস্কার কর,তাহলেই তুমি তাঁকে লাভ করবে।

৪২। সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ করলে, সাধকের লাভ কী হবে ?

উত্তরঃ সর্বপাপ থেকে তিনি সাধককে রক্ষা করবেন।

৪৩। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় ধৃতরাষ্ট্রের কতটি শ্লোক রয়েছে ?

উত্তরঃ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় ধৃতরাষ্ট্রের ১টি শ্লোক রয়েছে।

৪৪। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় সঞ্জয়ের কতটি শ্লোক রয়েছে?

উত্তরঃ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় সঞ্জয়ের ৪০ টি শ্লোক রয়েছে।

৪৫। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় অর্জুনের কতটি শ্লোক রয়েছে?

উত্তরঃ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় অর্জুনের ৮৫টি শ্লোক রয়েছে।

৪৬। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় শ্রীভগবানের কতটি শ্লোক রয়েছে?

উত্তরঃ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় শ্রীভগবানের ৫৭৪টি শ্লোক রয়েছে।

৪৭। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের শঙ্খের নাম কী?

উত্তরঃ শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খের নাম-পাঞ্চজন্য ও অর্জুনের শঙ্খের নাম দেবদত্ত।

৪৮। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় অনুষ্টুপ ছন্দের শ্লোক কতটি রয়েছে?

উত্তরঃ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় অনুষ্টুপ ছন্দের শ্লোক ৬৪৬ টি (১ম-১৮ অধ্যায় পর্যন্ত) রয়েছে।

৪৯। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য ছন্দগুলো কী কী?

উত্তরঃ অনুষ্টুপ,উপজাতি,ইন্দ্রবজ্রা,উপেন্দ্রবজ্রা ও বিপরীতপূর্বা।

৫০। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার সবচেয়ে বেশি শ্লোক কোন ছন্দে রয়েছে?

উত্তরঃ অনুষ্টুপ ছন্দে।

৫১। দ্রোণাচার্য্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম শিষ্য কে?

উত্তর: দ্রোণাচার্য্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম শিষ্য অর্জুন।

৫২। অর্জুনের মাতার নাম কি?

উত্তর: কুন্তী।

৫৩। অর্জুনের মাতা কুন্তীর আরেক নাম কি?

উত্তর: পৃথা।

৫৪। পঞ্চ পাণ্ডবের নাম কী?

উত্তর: যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন,নকুল ও সহদেব।

৫৫। কর্ণের পরিচয় দিন?

উত্তর: কর্ণ কুন্তীর কানীন পুত্র। সূর্যের অনুগ্রহে কুন্তী কুমারী অবস্থায় গর্ভবতী হন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কর্ণ অর্জুনের হাতে নিহত হন।

৫৬। দূর্যোধন কে?

উত্তর: দূর্যোধন হস্তিনাপুরের রাজা ধৃতরাষ্টের বড় ছেলে। মা গান্ধারী। দুর্যোধন অত্যাধিক অভিমানী ও ঈর্ষাপরায়ন। বাবা জন্মান্ধ বলে কাকা পাণ্ডু রাজা হলেন। তাতেই তার ঈর্ষা বেড়ে যায়। এতে দূর্যোধন ও পান্ডবদের মধ্যে রাজ্য ভাগ হয়। কপট পাশা খেলায় যুধিষ্ঠিরকে হারিয়ে দূর্যোধন পান্ডবদেরকে ১২ বছর বনবাস ও ১ বছর অজ্ঞাতবাসে পাঠিয়ে নিজেই রাজ্য ভোগ করেন । বনবাস থেকে পান্ডবেরা ফিরে এলে প্রতিজ্ঞামতে তিনি পান্ডবদেরকে তাদের রাজ্যযশ ফিরিয়ে না দিয়ে যুদ্ধঘোষনা করেন।

৫৭। দ্রোণ কার ছেলে?

উত্তর: ভরদ্বাজ মুনির ছেলে।

৫৮। দ্রোণ কাদেরকে অস্ত্রশিক্ষা দেন?

উত্তর: দ্রোণ কুরু ও পাণ্ডব বালকদেরকে অস্ত্র শিক্ষা দেন।

৫৯। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দ্রোণ কাদের পক্ষ অবলম্বন করেন?

উত্তর: কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দ্রোণ দূর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করেন।

৬০। ভগবান কীসের উপর ভিত্তি করে চার শ্রেণীর বর্ণ সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর: প্রকৃতির তিনটি গুণ ও কর্ম অনুসারে ভগবান মানব সমাজে চারটি বর্ণ বিভাগ সৃষ্টি করেছেন।

৬১। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার প্রথম অধ্যায়ের নাম কি?

উত্তর: শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার প্রথম অধ্যায়ের নাম অর্জুন বিষাদ-যোগ।

৬২। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার প্রথম অধ্যায়ে মোট কতটি শ্লোক রয়েছে।

উত্তর: ৪৬টি

৬৩। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম কি?

উত্তর: সাংখ্যযোগ।

৬৪। সাংখ্যযোগ অধ্যায়ে মোট শ্লোক সংখ্যা কত?

উত্তর: ৭২ টি

৬৫। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় কোন পাঁচটি বিষয় মুখ্যত আলোচিত হয়েছে?

উত্তর: ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম।

৬৬। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা কয়টি ষটকে বিভক্ত? ষটকগুলোর নাম কী?

উত্তর: ৩টি। যথা-১। কর্মষটক (১ম থেকে ৬ষ্ঠ অধ্যায়), ২। ভক্তিষটক (৭ম থেকে ১২ অধ্যায়) , ৩। জ্ঞানষটক (১৩শ থেকে ১৮শ অধ্যায়।)

৬৭। গীতাজ্ঞান কে, কাকে, কোন স্থানে প্রদান করেছিলেন?

উত্তর:ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয়সখা ও শিষ্য অর্জুনকে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে প্রদান করেছিলেন।

৬৮। গীতায় অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রথম শিক্ষা কী ছিল?

উত্তর: যিনি জ্ঞানী তিনি জানেন দেহ কী ও আত্মা কী ? তাই তিনি জীবিত অথবা মৃত কোন অবস্থাতেই দেহের জন্য শোক করেন না।

৬৯। গীতার ৭০০টি শ্লোকের মধ্যে কে কতটি বলেছেন?

উত্তর: ধৃতরাষ্ট্র-১টি, সঞ্জয়-৪০টি, অর্জুন-৮৫টি ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-৫৭৪টি শ্লোক বলেছেন।

৭০। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কতক্ষণ সময়ে গীতার জ্ঞান দান করেছিলেন?

উত্তর: মাত্র ৪০ মিনিটে।

৭১। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্ব প্রথম গীতার জ্ঞান কাকে দান করে ছিলেন?

উত্তর: সূর্যদেব বিবস্বানকে।

৭২। সূর্যদেব গীতার জ্ঞান কাকে দিয়েছিলেন?

উত্তর: মানব জাতির জনক মনুকে।

৭৩। কত বছর পূর্বে পাণ্ডুপুত্র অর্জুন গীতার জ্ঞান পেয়েছিলেন?

উত্তর: এখন থেকে প্রায় ৫২০০ বছর পূর্বে।

৭৪। কোন অধ্যায়কে গীতার সারাংশ (সারসংক্ষেপ) বলা হয়?

উত্তর: দ্বিতীয় অধ্যায়কে।

৭৫। গীতায় নারীর কয়টি গুণের কথা বলা হয়েছে?

উত্তর: ২৬টি।

৭৬। গীতার উহ্যনাম কয়টি?

উত্তর: ১৮টি।

৭৭। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কোন তিথিতে গীতা জ্ঞান দান করেছিলেন?

উত্তর: মোক্ষদা একদশী তিথিতে।

৭৮। কখন গীতা জয়ন্তী পালন করা হয়?

উত্তর: মোক্ষদা একাদশী তিথির দিনে।

৭৯। গীতার সারমর্ম কোন চারটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে?

উত্তর: ১০ম অধ্যায়ের ৮ থেকে ১১ নং শ্লোকে।

৮০। গীতায় অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে ও শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কয়টি নামে সম্বোধন করেছেন?

উত্তর: গীতায় অর্জুন ৪৫টি নামে শ্রীকৃষ্ণকে আর শ্রীকৃষ্ণ ২১টি নামে অর্জজুনকে সম্বোধন করেছেন।

৮১। অর্জুন কখন বুঝতে পারলেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান বা পরমেশ্বর?

উত্তর: গীতার ১১ অধ্যায়ের বিশ্বরূপ দর্শন যোগের মাধ্যমে।

৮২। আত্মার বৈশিষ্ট্য কী?

উত্তর:আত্মার কখনো জন্ম হয় না, মৃত্যু হয় না বা বৃদ্ধি হয় না। আত্মাকে অস্ত্রের দ্বারা কাটা যায় না, আগুনে পুড়ানো যায় না, জলে ভিজানো যায় না অথবা হাওয়াতে শুকানো যায় না। আত্মাজন্মরহিত, শাশ্বত, নিত্য এবং পুরাতন হলেও চির নবীন।

৮৩। ভগবান কখন এ পৃথিবীতে আবির্ভূত হন?

উত্তরঃ যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন ভগবান নিজেকে প্রকাশ করে আবির্ভূত হন।

৮৪। ভগবান কেন অবতীর্ণ হন?

উত্তরঃ সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য ভগবান যুগেযুগে অবতীর্ণ হন।

৮৫। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার ১৮শ অধ্যায়ে মোট কতটি শ্লোক রয়েছে ?

উত্তর : ৭৮ টি

৮৬। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের নাম কি ?

উত্তর : জ্ঞান-যোগ।

৮৭। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের শ্লোক সংখ্যা কত ?

উত্তর : ৪২টি

৮৮। ধৃতরাষ্ট্রের পিতার নাম কি?

উত্তরঃ বিচিত্রবীর্য।

৮৯। ব্যাসদেব এর পিতা এবং মাতার নাম কি?

উত্তরঃ ব্যাসদেব এর পিতা পরাশর মুনি এবং মাতা সত্যবতী।

৯০। ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রীর নাম কি ?

উত্তরঃ গান্ধারী ।

৯১। সনাতন ধর্মের মুল গ্রন্থ কি ?

উত্তরঃ বেদ।

৯২। বেদ কত প্রকার ও কি কি?

উত্তরঃ ০৪ প্রকার। যথা- ঋকবেদ, সামবেদ, যর্জুবেদ, অথর্ববেদ।

৯৩। পুরাণ কয়টি ?

উত্তরঃ ১৮টি।

৯৪। চণ্ডীর অপর নাম কি ?

উত্তরঃ সপ্তসতী (৭০০ শ্লোক)।

৯৫। সনাতন ধর্মের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ধর্মগ্রন্থের নাম বল।

উত্তরঃ বেদ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, চণ্ডী, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি।

৯৬। চারযুগের নাম কি কি ?

উত্তরঃ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি।

৯৭। সনাতন ধর্মের উল্লেখযোগ্য তীর্থস্থানের নাম বল।

উত্তরঃ গয়া, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, মায়াপুর, হরিদ্বার, বদ্রীনাথ, দেওঘর, নবদ্বীপ, প্রয়াগ, সীতাকুণ্ড, লাঙ্গলবন্দ, আদিনাথ, কৈবল্যধাম, শ্রীশ্রী শঙ্কর মঠ ও মিশন মন্দির, কৈলাস প্রভৃতি।

৯৮। আদিনাথ মন্দির কোথায় অবস্থিত?

উত্তরঃ বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলায় অবস্থিত। এটি একটি শিব মন্দির।

৯৯। স্বর্গের দেবতার নাম কি ?

উত্তরঃ ইন্দ্র।

১০০। মৃত্যুর দেবতার নাম কি ?
উত্তরঃ যমরাজ।
১০১। বিদ্যার দেবী কে?
উত্তরঃ সরস্বতী।
১০২। ধন সম্পদের দেবী কে?
উত্তরঃ লক্ষ্মী।
১০৩। মা লক্ষ্মীর বাহন কি ?
উত্তরঃ পেঁচা।
১০৪। সরস্বতী দেবীর বাহন কি ?
উত্তরঃ রাজহাঁস।
১০৫। মা দুর্গার বাহন কি ?
উত্তরঃ সিংহ।
১০৬। গণেশের বাহন কি ?
উত্তরঃ ইঁদুর।
১০৭। কার্ত্তিকের বাহন কি ?
উত্তরঃ ময়ূর।
১০৮। কোন মাসকে দামোদর মাস বলে?
উত্তরঃ কার্তিক মাসকে।
১০৯। মা দুর্গার কয় হাত?
উত্তরঃ ১০ হাত।
১১০। মা দুর্গার কয় ছেলে?
উত্তরঃ দুই ছেলে। গণেশ ও কার্ত্তিক।
১১১। কবে থেকে সনাতন ধর্মের উৎপত্তি হয়?
উত্তরঃ সৃষ্টির আদি থেকে।
১১২। শ্রীকৃষ্ণের কতটি নাম?
উত্তরঃ ১০৮টি।
১১৩। শ্রীমদ্ভাগবত কী?
উত্তরঃ ভগবানের লীলা, কীর্তন ও স্তুতি সম্বন্ধীয় বিষয় হচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবত। এটি একটি পুরাণ।
১১৪। মহাভারতের মোট কয়টি পর্ব আছে?
উত্তরঃ ১৮টি।
১১৫। রামচন্দ্রের পিতার নাম কি?
উত্তরঃ রাজা দশরথ।
১১৬। রামায়ণে কাদের কাহিনী আছে?
উত্তরঃ রাম ও রাবণের যুদ্ধকাহিনী।
১১৭। সনাতন ধর্মের কয়জন মহাপুরুষের নাম বল?
উত্তরঃ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রী জগদ্বন্ধু সুন্দর, শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দ, শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর, শ্রী রামঠাকুর, মা আনন্দময়ী, শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ।

১১৮। দশজন অবতারের নাম বল ?

উত্তর: ১। মৎস্য, ২। কুর্ম অবতার, ৩। বরাহ অবতার, ৪। নৃসিংহ অবতার, ৫। বামন অবতার, ৬। পরশুরাম অবতার, ৭। রাম অবতার, ৮। বলরাম অবতার, ৯। বুদ্ধ অবতার, ১০। কল্কি অবতার।

১১৯। ব্রহ্মা কে?

উত্তর: ঈশ্বর যে রূপে সৃষ্টি করেন, তাঁর নাম ব্রহ্মা।

১২০। ব্রহ্মার বাহন ও আসন কী ?

উত্তর: রাজহাঁস তাঁর বাহন আর লালপদ্ম তাঁর আসন।

১২১। বিষ্ণু কে?

উত্তর: বিষ্ণু হচ্ছে পালনকর্তা। ঈশ্বরের পালন করার গুণের প্রকাশ হচ্ছে বিষ্ণু রূপ।

১২২। বিষ্ণুর বাহন কি?

উত্তর: গরুড় পাখি।

১২৩। সকল পূজার আগে কোন পূজা করা হয় ?

উত্তর: গণেশ পূজা।

১২৪। ঈশ্বর এক না বহু?

উত্তর: ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়।

১২৫। রামায়ণ কে রচনা করেছেন?

উত্তর: মহামুনী বাল্মিকী (সংস্কৃত ভাষায়)।

১২৬। মহাভারতের রচয়িতা কে?

উত্তর: মহর্ষি ব্যাসদেব।

১২৭। বাংলায় রামায়ণ কে রচনা করেছেন?

উত্তর: পণ্ডিত কৃত্তিবাস ওঁঝা।

১২৮। রামায়ণে মোট কয়টি কাণ্ড বা ভাগ আছে?

উত্তর: ৭টি কাণ্ড।

১২৯। বেদ অর্থ কি?

উত্তর: জ্ঞান। যে জ্ঞান চিরন্তন তাই বেদে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১৩০। বেদ কে রচনা করেছেন?

উত্তর: বেদ ঈশ্বরের বাণী। ঋষিরা তা দর্শন করেছেন। তাই বেদ সৃষ্ট না দৃষ্ট। বেদ অপৌরুষেয়। বেদের অপর নাম শ্রুতি।

১৩১। পুরাণ কি?

উত্তর: সনাতন ধর্মাবলম্বীদের একটি বিশেষ ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে পুরাণ। বিভিন্ন ইতিহাস এবং দেব দেবীর সম্বন্ধে রচিত গ্রন্থ হচ্ছে পুরাণ।

১৩২। ধর্মের লক্ষণ কয়টি ও কি কি?

উত্তর: ১০টি যথা: ১। ধৃতি (ধৈর্য), ২। ক্ষমা, ৩। দম বা বহিরিন্দ্রিয় দমন, ৪। অস্তেয় (চুরি না করা) ৫। শুচিতা, ৬। ইন্দ্রিয় সংযম, ৭। শুভবুদ্ধি, ৮। বিদ্যা, ৯। সত্য ও ১০। অক্রোধ।

১৩৩। স্বর্গের রাজধানীর নাম কি?

উত্তর: অমরাবতী।

১৩৪। কারা স্বর্গে বাস করেন?

উত্তর: যারা সৎ কর্ম করে পুণ্য অর্জন করে তাঁরা আর দেবতারা।

শ্রীভগবান্ উবাচ
চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্ ॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ০৪/১৩)

সরলার্থ : শ্রীভগবান বলেছেন- প্রকৃতির তিনটি গুণ ও কর্ম অনুসারে আমি মানব সমাজে চারটি বর্ণবিভাগ সৃষ্টি করেছি । আমি এ প্রথার স্রষ্টা হলেও আমাকে অকর্তা এবং অব্যয় বলে জানবে ।।

সাবিত্রী (ব্রহ্ম গায়ত্রী) মন্ত্র-
ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ।
তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ।
ভর্গোদেবস্য ধীমহি ।
ধিয়ো যো (ইয়ো) নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ (ঋগ্বেদ-৩/৬২/১০)

সরলার্থ : যিনি বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণস্বরূপ,যিনি সৎ-চিৎ-আনন্দ এবং আমাদের বুদ্ধির প্রেরণাদাতা, সেই সদা লীলাময় জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বরের বরণীয় জ্যোতির্ময় তেজকে বা রূপকে আমরা ধ্যান করি । আমরা প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে সর্বদা কল্যাণময় কার্যে নিয়োজিত করেন ।

স্বস্তি মন্ত্র-
ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ, স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ ।
স্বস্তি নঃ তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্'দধাতু ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ (ঋগ্বেদ-১/৮৬/৬)

সরলার্থ : বৃদ্ধশ্রবাঃ ইন্দ্র, আমাদের দেহের (স্বস্তি) মঙ্গল করুন । (বিশ্ববেদাঃ) সর্বজ্ঞানাধার (পূষা) জগৎ-পোষক দেবতা আমাদের (মানস রাজ্যের) কল্যাণ বিধান করুন । (অরিষ্টনেমিঃ) হিংসানিবারক (তার্ক্ষ্যো) গরুড় আমাদের মঙ্গল করুন । দেবগুরু বৃহস্পতি আমাদের (আধ্যাত্মিক রাজ্যের) মঙ্গল (দুধাতু) বিধান করুন । আমাদের ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হউক ।

শিক্ষাবর্ষ-২০২৫

গীতা-সারকথা

যা হয়েছে তা ভালোই হয়েছে,
যা হচ্ছে তা ভালোই হচ্ছে,
যা হবে তা ভালোই হবে।
তোমার কী হারিয়েছে, যে তুমি কাঁদছো?
তুমি কী নিয়ে এসেছিলে, যা তুমি হারিয়েছ?
তুমি কী সৃষ্টি করেছ, যা নষ্ট হয়ে গেছে?
তুমি যা নিয়েছ, এখান থেকেই নিয়েছ;
যা দিয়েছ এখানেই দিয়েছ।
তোমার আজ যা আছে,
কাল তা অন্য কারো ছিল,
পরশু সেটা অন্য কারো হয়ে যাবে;
পরিবর্তনই সংসারের নিয়ম।

(মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও বয়স্ক স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য)